প্রথম প্রকাশ :
অগ্রহায়ণ, ১৩৫৯

পাণ্ডুলিপি : অনুবাদ বিভাগ

প্রকাশক :
বশীর আল্‌হেলাল
পরিচালক, প্রকাশন ও বিক্রয় বিভাগ
বাংলা একাডেমী
ঢাকা।

মুদ্রাকর :
বাংলা একাডেমী প্রেস
বর্ধমান হাউস, ঢাকা।

প্রচ্ছদ : সালাহউদ্দীন বুলবুল

সূচীপত্র

অনুবাদক	ভূমিকা	চার
ফাদিল দেভেনিচা	ওজন-যন্ত্র	১
বোগ্দান শেক্লার	পরাগ	৬
বোশ্কো দোব্রোয়েভিচ	বিক্রয়িকা	১৩
ধ্রাঙ্কো চোনিচ	তাপ-প্রবাহ	২০
ভোয়িস্লাভ জোরিচ	প্রবীণদের লীগের কাছে পত্র	২৭
মিল্কা বুন্য়েভাচ-গ্রুয়োভিচ	১৪ নম্বর কক্ষ	৩২
মিলাদিন চুলাফিচ	আপেল	৩৬
মিলান আন্দ্রিচ	পেস্তা	৪৪
মিলিসাভ সাভিচ	কমরেড	৫১
য়েভ্রেম বৃকোভিচ	মালিশা পালোয়ান	৫৫
য়োভান লুবারদিচ	সবার গল্প	৫৯
রাঙ্কো সিমোভিচ	অগ্নিকাণ্ড	৬৪
রাদোমির আন্দ্রিচ	দেয়ালের আড়ালে	৭২
ল্যুবোমির তেশিচ	তালাক	৭৬
স্লাভিচা চোলাক	পার্ক	৮৪

ভূমিকা

১৯৭৯ সালের অক্টোবর মাসে আমি বেলগ্রেড গিয়েছিলাম ওখানকার একটি আন্তর্জাতিক লেখক-সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করতে। ছিলাম মাত্র সাত দিন। দু-দিনের আলোচনা-বৈঠক বাদে বাকি দিনগুলো কেটেছে দর্শনীয়-দর্শন, অভ্যর্থনা, ভোজ, ইত্যাদিতে। যুগোস্লাভিয়ার সমকালীন সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ প্রায় কিছুই হয় নি। এ-ব্যাপারে সবচেয়ে বড় অসুবিধা অবশ্য ছিল, ইংরেজীতে তেমন কিছু পাওয়া যায় না। অল্প কিছু কবিতা পড়েছি, কবিতা সম্পর্কিত দু-একটি আলোচনা, অন্য কতকগুলো সাহিত্যসমালোচনা পড়েছি, দুটি উপন্যাসের খণ্ডাংশ পড়েছি। এই দিয়ে একটা দেশের সাহিত্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা করা যায় না। তবু তাঁদের দু-তিনটি কবিতার অনুবাদ এবং যুগোস্লাভিয়ার কবিতা সম্পর্কে খুবই সামান্য একটু আলোচনা অন্যত্র করেছি। আমার যুগোস্লাভিয়া-ভ্রমণের নাতি-হ্রস্ব একটি বিবরণও অন্যত্র প্রকাশিত হয়েছে।

ওই ভ্রমণ-বৃত্তান্তে আমি আজকের যুগোস্লাভিয়ার সাহিত্য সম্পর্কে সাধারণভাবে এই কথা বলেছি যে যুগোস্লাভিয়ায় আসার আগে তাঁদের সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক আদর্শ সম্পর্কে আমার মনে এক রকমের পূর্ব-ধারণা ছিল। সেটা, ধরুন, তাঁদের মুক্তিযুদ্ধ, বিপ্লব, রাষ্ট্রনৈতিক-সামাজিক আদর্শ ইত্যাদিকে নিয়ে আমার যে ধারণা তাকে নিয়েই গড়ে উঠেছিল। কিন্তু, আমি যেটুকু দেখেছি, আমার ধারণা খুব সমর্থন পায় নি। তাঁদের সমাজ ও রাষ্ট্রাদর্শ সমাজতান্ত্রিক। সমাজতান্ত্রিক সমাজে বৈচিত্র্য ও প্রক্ষেপ যদি অনেক দূর পর্যন্ত থাকেও, তবু সাহিত্যে শিল্পে সমাজতান্ত্রিক স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্যের ব্যাপক ও সংহত আয়োজন ও স্ফূরণ দেখা যাবে এ অতি স্বাভাবিক প্রত্যাশা। এই আয়োজন ও স্ফূরণ নেই এ-কথা আমি জোর দিয়ে বলতে পারি না। তাঁদের সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় আমার সামান্যই হয়েছে। তবু, যেটুকু হয়েছে তাতে মনে হলো, তাঁরা পুরো মাত্রায় তথাকথিত স্বাধীন চিন্তার অধিকার অর্থাৎ লাইসেন্স ভোগ করছেন।

পাঁচ

কবিতার কথা বলতে গেলে, সমকালীন কবিতা সম্পর্কে তাঁদের এক প্রধান কবির খেদ হচেছ কবিতা কবিতা হচ্ছে না, ক্লাসিসিজম ও ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে। কিন্তু এই কবির নিজের যে কোনো জীবনবাদী বা বস্তুমুখী কাব্য-লক্ষ্য আছে এমন মনে হয় না। তাঁর কাছে কবিতা শব্দের জাদু এবং শব্দের অনন্ত সমুদ্র মাত্র। জাগতিক বস্তু কবিতার কল্প-কাননে প্রবেশ করে অবাস্তব রূপ পরিগ্রহ করে, এই তাঁর কাব্যাদর্শ। যাই হোক, আবার বলা দরকার যে যুগোস্লাভিয়ার আজকের সমগ্র কাব্যাদর্শ এই হতে পারে না। আমি কেবল এই কথাই বলতে চেয়েছি, সমাজতান্ত্রিক শিল্পাদর্শে যে গণ-চেতনা, বস্তুবোধ, মূল্যচেতনা, বিকাশের দীপ্তি ও আশাবাদ স্বভাবতই প্রত্যাশিত, তা খুব দেখতে আমি পাই নি। লেখকদের সমাজদৃষ্টিতে বস্তুবাদ ও ভাববাদ মহানন্দে গলা-জড়াজড়ি করে আছে।

ছোটগল্পের কথা বলার আগে তাঁদের উপন্যাস সম্পর্কে দু-এক কথা বলি, যদিও তাঁদের উপন্যাসও আমি এমন কিছু পড়ি নি। তবু বলছি এইজন্য যে তাঁদের সমগ্র সাহিত্যের মধ্যে তাঁদের ছোটগল্পের স্থানটি কেমন সে সম্পর্কে কিছুটা ধারণা করা হয়তো সম্ভব হবে।

যুগোস্লাভিয়ার কথাসাহিত্য উন্নত। স্মরণীয় যে ১৯৬১ সালে আইভো আন্দ্রিচ (জন্ম ১৮৯২) উপন্যাসে নোবেল পুরস্কার পান। যুগোস্লাভিয়ার আজকের উপন্যাসে পশ্চিম ইউরোপের, আমেরিকার উপন্যাসের সঙ্গে তাল মেলাবার চেষ্টা রয়েছে। সেদিক থেকে, যথেষ্ট অগ্রসর ও আধুনিক তাদের সমকালীন উপন্যাস। শক্তিশালী গদ্য ঔপন্যাসিকদের হাতে রয়েছে। অশেষ বর্ণনা ও মনোবিশ্লেষণ তাঁদের উপন্যাসের প্রধান দিক। কাহিনী, নাটকীয়তা, এ-সব প্রধান নয়। বাস্তবের বুদ্ধিবাদী অনুসন্ধান খুব হয়। মনস্তাত্ত্বিক ও বুদ্ধিবাদী বিশ্লেষণ দিয়ে বাস্তবকে কেটে-ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করা হয়। তখন এই বাস্তব লেখকের এক আত্মিক সঙ্কট হয়ে ওঠে এবং শেষে এমন অবস্থা দেখা দেয় যে বাস্তব পিষ্ট বিক্ষিপ্ত হতে হতে যেখানে গিয়ে পৌঁছায় সেখানে বাস্তব আর বাস্তব থাকে না। বাস্তব আর বিমূর্তের সীমারেখা লুপ্ত হয়ে যায় এবং সেটা বিমূর্তের স্বার্থেই করা হয়। ক্লান্ত, বিষন্ন বা স্ত্রী-পরিত্যক্ত মানবেরা উপন্যাসের প্রধান

চরিত্র হয়। তাঁদের উপন্যাস থেকে আজকের যুগোস্লাভিয়ার বুদ্ধিজীবীদের যে মানস-প্রকৃতির ও সমাজ-পরিস্থিতির পরিচয় পাওয়া যায় তা খুব স্বাস্থ্যপ্রদ বলে মনে হয় না। যাই হোক, আমার এই ধারণাকে খণ্ডিত ধারণা বলেই গ্রহণ করতে হবে।

ছোটগল্পে এসে চিত্র সম্পূর্ণ বদলে যাবে এমন হয় না। তবে ছোটগল্পের সংহত অবয়বে যুগোস্লাভিয়ার আজকের জীবন ও সাহিত্যের অন্য স্বাদ বেশ লাভ করা যায়। তাঁদের সমাজ-পরিস্থিতির পরিচয় আরো ভালোভাবে ও পূর্ণরূপে পাওয়া যায় তাঁদের সমকালীন ছোটগল্প থেকে। তরুণ লেখকদের অনেকগুলো ছোটগল্প পড়ার সুযোগ আমার হয়েছে। ১৯৭০ সালের দিকে বেলগ্রেডের সাময়িকী 'রিভিউ' দেশ-ব্যাপী ছোটগল্প প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন। ৩৫ বা তার কম যাঁদের বয়েস তাঁদের এতে অংশগ্রহণ করতে দেয়া হয়। প্রতিযোগিতায় প্রাপ্ত গল্পগুলি থেকে পঁয়ষট্টিটি গল্প নির্বাচন করে 'রিভিউ' ইংরেজীতে মস্ত এক সঙ্কলন প্রকাশ করেন। এই বই একখানা ঢাকাস্থ যুগোস্লাভ দূতাবাস আমাকে অনুগ্রহ করে দেন। এর থেকেই বর্তমান সঙ্কলনের গল্পগুলি আমি অনুবাদ করেছি। ইংরেজীতে যা পেয়েছি মূলে নিশ্চয় গল্পগুলো তার চেয়ে বেশি প্রসাদমণ্ডিত ছিল।

এই সব গল্প পরিসরে ছোট, সংহত। দেখা যাচ্ছে, ছোটগল্পের সিদ্ধ ও স্বীকৃত প্রকরণকে তাঁরা নিষ্ঠার সঙ্গে মানেন। অসাধারণ, কালজয়ী সব গল্প যে তাঁরা লিখেছেন এমন নয়। তবু গল্পগুলি পড়ে চমৎকার অভিজ্ঞতা লাভ করেছি, বলা যায়, ছোটগল্প পাঠের আনন্দ খুবই উপভোগ করেছি।

স্বভাবতই, যুগোস্লাভিয়ার প্রায় সমগ্র জীবন ও সমাজ এই সব গল্পে উঠে এসেছে। নানা বিষয়, নানা পরিপ্রেক্ষিত, শহর থেকে গ্রাম, কৃষক থেকে শ্রমিক, রাজনৈতিক কর্মী থেকে শিক্ষক বুদ্ধিজীবী এই সব গল্পে রূপায়িত হয়েছে। জীবনধর্মী, কাহিনী-নির্ভর গল্প থেকে মনস্তাত্ত্বিক, ভাবাত্মক, আত্মদর্শনে-পূর্ণ গল্প সব রয়েছে। মুক্ত মনে, মুক্ত কলমে তাঁরা লেখেন। আদর্শ প্রচারের প্রয়াস বা আগ্রহ কমই দেখা যায়। বরং সামাজিক ও মানবিক গ্লানি, অবিচার, বিশৃঙ্খলা,

দারিদ্র্যের ছবি এমন অকুণ্ঠভাবে অঙ্কিত হয়েছে যে আমি বিস্ময় মেনেছি। উচচ ভাবের, মিষ্টি প্রেমের গল্পও রয়েছে। আমাদের বাংলাদেশের ছোটগল্পের সঙ্গে এইসব গল্পের কেমন যেন আত্মীয়তা অনুভব করা যায়। তবে জটিল ও বিমূর্ততার প্রক্রিয়া ও প্রকরণ থেকে তুলনামূলকভাবে তরুণ এইসব গল্পকার যেন সরে এসেছেন বা আসছেন বলে মনে হয়। সেদিক থেকে, তাঁদের আগের সাহিত্যে বা অন্যান্য সাহিত্য সম্পর্কে পূর্বে যে সব কথা বলেছি তার থেকে উত্তরণ বলুন আর অবরোহণ বলুন স্পষ্ট কিছু ব্যতিহার যে হচেছ সেটা বোঝা যায়।

ছোটগল্প অদ্ভুত এক শিল্প। উপন্যাসের দিকে বা আজকের গীতিকবিতার দিকে আমরা যে দৃষ্টিতে তাকাই, ছোটগল্পের দিকে সে দৃষ্টিতে তাকাই না। উদ্ভবের পরে বিশ্ব জুড়ে আধুনিক ছোটগল্পের প্রভূত উন্নতি ও বিকাশ হয়েছে। তবু যেন একে ছোট শিল্প বলে মনে করা হয়। কী এর কারণ? এর কারণ হয়তো এই যে এ উপন্যাস থেকে ছোট। অন্য দিকে কবিতার সৌন্দর্য এ নিজের অঙ্গে জড়াতে চায়, কিন্তু কবিতা এ নয়, করিতার বনেদিয়ানা এ কোথায় পাবে। এ হচেছ দো-আঁসলা শিল্প। কিন্তু দো-আঁসলা মাটিতেই তো ফসল ভালো হয়। এই ছোটগল্পগুলি অনুবাদ করতে করতে একটা জিনিস আমি বিশেষভাবে অনুভব করছিলাম। না, ছোটগল্পের বিচিত্র এক বিশ্বজনীন ভাবশিল্প রয়েছে। ধরুন, আমরা যে এত বলি, আমাদের আধুনিক বাংলা কবিতার উপর পাশ্চাত্ত্য কবিতার ব্যাপক প্রভাব পড়ে চলেছে, এর অর্থ কী? এর অর্থ তাহলে দাঁড়ায় পাশ্চাত্ত্যের কবিতা অন্য রকম, প্রাচ্যের কবিতা, বাংলা কবিতা অন্য রকম। আমাদের ছোট-গল্পে পাশ্চাত্ত্যের প্রভাব পড়ে নি এমন কথা আমি বলছি না। কিন্তু তবু বিশ্বের দেশে-দেশে ছোটগল্প স্বতঃই বিশ্বজনীন এক ভাবশিল্প অভ্যস্ত করেছে। যুগোস্লাভীয়দের এবং বাঙালির কতকগুলি যন্ত্রণা আর বেদনা, জীবনের কতকগুলি সমস্যা, ঘটনা, সাধ, আহ্লাদ যুগোস্লাভিয়ার ও বাংলাদেশের গল্পগুলোকে এবং নিশ্চয় ইউরোপ-আমেরিকার গল্প-গুলোকে প্রায় এক রকম করে গড়ে তোলে। বিশ্ব জুড়ে এই এক রকম হওয়ার ব্যাপারটা ছোটগল্পের ক্ষেত্রে যত সত্য শিল্পের অন্য

মাধ্যমের ক্ষেত্রে তত সত্য নয়। দেশে-দেশে ছোটগল্পের প্রকরণের প্রভেদও বেশি হয় না। এক কথায় তার কারণ বোধ হয় এই যে ছোটগল্প নির্যাসের শিল্প। শিল্পের নির্যাস ও মানব-জীবনের নির্যাস এতে সমন্বিত হয়।

যুদ্ধের নানা অনুষঙ্গ ও বেদনা যুগোস্লাভিয়ার ছোটগল্পে আজও আসতে দেখা যায়, এটি লক্ষণীয়।

মাত্র পনের জন লেখকের পনেরটি গল্প অনুবাদ করতে পেরেছি। আরো অনেক লেখকের প্রতিই অবিচার করা হয়ে গেল। এর জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী। ইংরেজী সঙ্কলনটিতে ওঁরা যে নিয়মে গল্পগুলির অনুক্রম সাজিয়েছিলেন, সেই নিয়মে লেখকের নামের বাংলা বর্ণানুক্রম অনুসারে বর্তমান সঙ্কলনের গল্পগুলি সাজানো হয়েছে। যুগোস্লাভিয়ার লেখকরা আমাকে যে মধুর আতিথ্য দিয়েছিলেন সেই ঋণের সামান্যও যদি এর দ্বারা পরিশোধ হয়, নিজেকে ধন্য মনে করব।

বশীর আল্‌হেলাল

ফাদিল দেভেনিচা

ওজন-যন্ত্র

আমি মানুষ ওজন করি। আমার একটা ওজন-যন্ত্র আছে। যে চায় তাকেই আমি ওজন করি। অবশ্য, সত্যি বলতে কি, প্রায়ই এই রকম ঘটে যে আমার ঠিক সামনে এসে দাঁড়িয়ে লোকে হঠাৎ ঠিক করে বসে, না, পয়সা নষ্ট করবে না। এই সব লোক ওজন আর স্বাস্থ্যকে নিয়ে যে পুরনো প্রবচনটি রয়েছে সেটি নিশ্চয় অনেক শুনেছে, যেমন শুনেছে পাক-সাফ থাকা কিংবা পরহেজগার থাকা ইত্যাদি সম্পর্কিত বচন। তাই আমি আওয়াজ দিয়ে খদ্দের ডাকা দরকার কিনা ওই নিয়ে মাথা ঘামাই না। কিছু মানুষ আছে যারা নিজেদের ওজন নিতে চায়, কিছু আছে নিতে চায় না। এদের মধ্যে কোন্ পক্ষের কী বক্তব্য হতে পারে তাই নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না। মাত্র একটাই লিখন আমি লিখে রেখেছি, যেটির কাজ বিজ্ঞাপন-রূপে শুরু হয়েছিল, কিন্তু এখন যেন আইন হয়ে বসে আছে। সেটি এইঃ "যদি প্রমাণ করিতে পারেন আমার এই ওজন-যন্ত্র সঠিক ওজন দেয় না, আমি আপনাকে ১০০ নয়া দিনার প্রদান করিব।"

মেয়েটি ঠিক কবে যে তার ওজন নিতে এসেছিল আমার মনে নেই। এবং কেন মনে নেই, মনে হয়, আপনারা তা বুঝতে পারেন। সাধারণভাবে বলা যায়, পথচারীরা চায় না আমি তাদের চিনে রাখি। এবং কেউ যদি ঘনিষ্ঠতা করতে চায় সেই ব্যাপারটাও আমি তাদের উপরেই ছেড়ে দিই। মেয়েটা যে আসত তার ওই একটাই সম্ভাব্য কারণ আমার মনে হতো। সে যন্ত্রের উপর এসে দাঁড়াত, আমি মানদণ্ড ছেড়ে দিতাম, মাপক সরাতাম, সমান করতাম, বার-দুই তাকিয়ে দেখে পড়ে শোনাতামঃ ছাপান্ন কিলো। বলতাম, ভালো ওজন।

আমি কখনো পয়সার জন্যে হাত বাড়াই না। একটা ছোট বাকসো রয়েছে, বৃষ্টি হবে মনে হলে বন্ধ করে রাখি। মেয়েটার হাতে থাকত পঞ্চাশ দিনারের পাকানো নোট, সেটাকে সে লম্বালম্বি আঙুলে পেঁচিয়ে চলত। ওইটার যথেষ্ট ভাংতি যদি আমার কাছে থাকত, তবু, বিশ্বাস

করুন আর নাই করুন, আমি যন্ত্র তুলে রেখে দু-দিন বিশ্রাম নিতাম। আমাদের এ কাজের কোনো ভবিষ্যৎ নেই।

আমার মানুষকে সন্দেহ করার বাতিক নেই, তাই তাকে বলতাম, পয়সা দিতে হবে না। সে লজ্জা পেত এবং স্পষ্টতই ভাবত আমি তাকে সন্দেহ করছি। তাই মাথা নত করে চলে যেত। আমি পেছন থেকে চিৎকার করে বলতাম, পয়সা দিতে হবে না! তখন মনে হতো সে বুঝতে পেরেছে।

সমগ্র ব্যাপারটি এত অল্প সময়ের মধ্যে শেষ হতো যে মেয়েটির তেমন বিশেষ কোনো কিছু আমার নজরে পড়ত না। যুব-বয়সের মানুষের মধ্যে বিশেষ রকমের তেমন কোনো কিছু সাধারণত দেখা যায় না। আমি অবশ্য লক্ষ্য করতাম সে যুবতী।

তার কথা শিগগির ভুলে গেলাম। আমি আমার কাজ করি। কেউ হয়তো একে কাজ বলবে, কেউ বলবে না। ওই তো মানদণ্ড তোলা, ওজন সরানো আর ১৫০ পর্যন্ত সংখ্যা পড়ে বলা, একে আবার কাজ বলে নাকি? তবে সত্যি কথাটা হচ্ছে, কেউ জানে না কখনো কখনো আমার পিঠ কী রকম টাটায়। অবশ্য আমি মনে করি না এতেই আমার কাজের প্রমাণ হয়। আমার এখন সেই বয়েস যখন মানুষ তার পুরনো যত ব্যথা অনুভব করতে শুরু করে, তাকে বাতে ধরে। এবং সন্ধ্যা হলে আমার চোখ ব্যথা করতে শুরু করে, যেন নাগরদোলা থেকে ছিটকে পড়ে যাওয়ার মতো ও দুটি খসে পড়ে যাবে, যদিও আমার চোখ ব্যথা করে সম্পূর্ণ অন্য কারণে।

সে এসে এমন একটা ভাব দেখাল যেন সেই একমাত্র মানুষ যে এই রকম পঞ্চাশ-দিনারের নোট বের করেছিল, অথচ আমি তাকে চিনতে পারছি না। এই ধরনের মানুষ আপনি সব সময়ই দেখেন। কিন্তু আমি একজনকেও দেখি নি যে ফিরে এসেছে। আমি যা না দেখার ভান করি, তারা তা মনে রাখে। সে আমার বাক্‌সে দুটো কুড়ি পয়সার মুদ্রা ফেলল। আমি কিছু বললাম না। কিন্তু ভাব দেখালাম এই রকমের আর একটা রোজগার করে নিতে আমি প্রস্তুত রয়েছি।

যন্ত্রে উঠে দাঁড়ানোর বদলে সে কেবল মৃদু হাসল, ভাবখানা এই যে তার মন থেকে বিরাট ওজন নেমে গেল।

আমি মনোযোগ দিয়ে তাকে দেখলাম। আমি দেখেছি, কিছু লোকের নিজস্ব গায়ের রং থাকে। তার গায়ের রংটিও কেমন বিশেষ রকমের, কিন্তু আমি বলতে পারব না সেই রং ঠিক কেমন। ফলের মধ্যে খুবানির কথা আমার মনে পড়ল। নীরবে হেসে তার সৌভাগ্য কামনা করলাম। আমি ভাগ্যে বিশ্বাস করি। ভাগ্য যদি না থাকত তাহলে এক মানুষ আর এক মানুষ থেকে আলাদা হয় কেমন করে?

আমার বড় সহজ কাজ। চেষ্টা বা প্রয়াসের কিছু নেই, কিছু চিন্তা করতে হয় না। আর সেই কারণে আমার কোনো তাড়া নেই। দিনের অধিকাংশ সময় আমি সোজা সামনে চোখ পেতে রেখে কাটিয়ে দিই, এবং ওই কথাই ভাবি, কত সোজা আমি তাকিয়ে রয়েছি, এবং ওই কারণেই আমার চোখ ব্যথা করে। দুই চোখের দৃষ্টি একাগ্রভাবে যন্ত্রের উপর ফেলি এবং অনুভব করি চোখ-দুটি তাদের যার-যার কাজ কেমন করে করছে। তখন ক্লান্ত হয়ে পড়ি এবং চোখ বন্ধ করে বিশ্রামের চেষ্টা করি। এমনকি, যখন ঘুমাই, সেই একই জিনিস দেখি। মানুষ চলেছে। কেউ লঘু পায়ে বেড়াতে বেরিয়েছে, কারো ভারি তাড়া। আমার কেবল একটুখানি চিন্তা হয় ওই যন্ত্রের সঠিকতার যে গ্যারাণ্টি দিয়েছি সেই সম্পর্কে। ওই যন্ত্রও আসলে ঠিক মানুষের মতো। আমার মনে হয় না মোটেই বাড়াবাড়ি হবে যদি বলি, কখনো কখনো একখানা বৈধ ডিপ্লোমার চেয়ে একটা সঠিক দাঁড়িপাল্লা খুঁজে পাওয়া কঠিন হতে পারে। কিন্তু যদি এটা কাউকে ঠকায় তার অর্থ দাঁড়ায় আমি তাদেরকে ঠকিয়েছি। আর তখন তাহলে কী কাণ্ড ঘটবে?

প্রথম দৃষ্টিতে তাকে অন্য যে কোনো মেয়ের মতো মনে হয়েছিল। সাধারণ চুল-বাঁধা, চলতি ফ্যাশানের ফ্রক, লেদা জুতো, এবং নকল চামড়ার হাত-ব্যাগ। কিন্তু তারপর আমার মনে হলো, না, এই সবই কোনো না কোনো দিক থেকে তার আপন, নিজস্ব। সময় অতি-বাহিত হলে তখন প্রত্যেককেই মনে হয় এক রকম। কিন্তু ওই মেয়ের সবকিছুকে মনে হলো তার নিজের।

সব সময় মনে হতো সে ঠিক সময়ে আসে। আমার এটা যুক্তিপূর্ণ মনে হয় যে আমি যাদের আমার খদ্দের বলি আমার তাদের কারো প্রেমে পড়া উচিত। অবশ্য একটা বিশেষ কায়দায় সেই কাণ্ড ঘটবে, কারণ যে কোনো প্রকারের প্রেম করার পক্ষেই আমার বয়েস অনেক বেশি। আমি যেটা করতে পারি, কাউকে স্রেফ ভালোবাসতে পারি, যখন তারা আসে বা বুঝতে পারি তারা আসছে ভালো বোধ করতে পারি। আমি চোখ বন্ধ করে সেই মেয়ের কথা ভাবি। আমাকে ভাবতে হয়, কারণ আমি তো স্বপ্ন দেখতে পারি না। আমি তার প্রতি অদ্ভুত ধরনের মায়া অনুভব করতে লাগলাম। লক্ষ্য করলাম, সে সুন্দরী, লাবণ্যময়ী। আর তা লক্ষ্য করার পরে আমি হঠাৎ এক মুহূর্তের জন্যে ভয় পেয়ে গেলাম। কে যেন আমাকে বলল, যুবতী মেয়েরা আজকাল আর সুখী নয়। ঈশ্বরের থেকে এ আলাদা, ঈশ্বরকে ডিক্রিজারি করে বিলোপ করা হয়েছে। কিন্তু সুখ পালিয়ে যায় যখন মানুষ তাকে শক্ত করে ধরার চেষ্টা করে। আমি নিজের ভয়টাকে ঠিক ধরতে পারলাম না, কারণ আমি ওই মেয়ের কাছে আর কিছুই আশা করি না, কেবল চাই সে যেন আসে। আমার যেন মনে হতো মুহূর্তের জন্যে আমার ওজন-যন্ত্র যখন তার জুতো-জোড়াকে আদর দেয়, সে-দুটি অন্য রকম সাড়া দেয়। এবং মেয়েটি যেন ওখানে সব সময় একটু বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে চায় বলে মনে হয়। আমাদের বন্ধুত্ব আলাপের মুখ চেয়ে বসে ছিল না। আমরা কখনো কথা বলতাম না। আমি কেবল বলতাম, "এই যে!" সে নীরবে হাসত। আমি তাকে শোনাতাম কত তার ওজন হয়েছে। সে চলে যেত।

দূর থেকে আমি তাকে তার চলন দিয়ে চিনতে পারি। তার পা মাটিতে বেশ দৃঢ়ভাবে পড়ে। তার পা ফেলার শব্দ স্ট্রীট-অর্গানের সঙ্গতের মতো যেন হয়ে উঠেছিল। ওই শব্দকে খুবই অসাধারণ মনে হয়। আমার ইচ্ছা হতে লাগল, সে আরো ঘন-ঘন আসুক। এবং ওই ইচ্ছাটার কারণে আমার অস্বস্তিও হতে লাগল।

আর সে? মনে হলো সে যেন আমার ইচ্ছা শুনতে পেয়েছে। প্রত্যেক দিন আসতে লাগল। আমি বেশি কাজ করি না, বেশি উপার্জনও করি না।

কিন্তু তবু আমার মনে হলো, কেউ যদি কেবল নিজের ওজনের পেছনে ওই পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে, সেটা মোটেই সামান্য কথা নয়। তার কাছে পয়সা নেব না বলে ভাবতে লাগলাম। কিন্তু সে চেষ্টা করে দেখা হলো না, কারণ আমি অবশ্যই জানতাম সে অপমান বোধ করবে। সেই কুড়ি-পয়সার মুদ্রাগুলি দিয়ে যেমন সে তার খেলাটাকে উপভোগ করে চলেছিল, তেমনি আমিও উপভোগ করে চলেছিলাম।

প্রথম আমি লক্ষ্য করলাম, ক্রমাগত তার ওজন বাড়ছে। যন্ত্রটাতে মেলাতে গিয়ে এমন সামান্য অবোধ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা যেতে লাগল যা কেবল পাকা হাতের পক্ষেই ধরা সম্ভব। কয়েক দিন পর আমাকে মাপক একটু সরাতে হলো। ধীরে ধীরে, ক্রমান্বয়ে তার দেহ-রেখা বদলাতে লাগল। নিতম্বে তার স্কার্ট আঁটো হয়ে গেল, বুক উঁচু হলো, হাঁটা ভারি হয়ে উঠল। শেষ পর্যন্ত তার চলন হয়ে উঠল মোটা ভারি মেয়েমানুষের মতো।

আমি তার আসার আশা ছেড়ে দিলাম ঠিক যখন সে তার বুক থেকে নিচের দিকে কেমন এক রকমের অনিচ্ছাকৃত দেহভঙ্গি করতে লাগল, যেন তার পেটটিকে আগলাবাব চেষ্টা করছে। আমার তখন আর সন্দেহ রইল না, যুবতী মেয়েদের সুখ নামক সেই জিনিস আছে। যত দিন পর্যন্ত তাদের কাছে তা অজানা থাকে কিংবা যখন তারা তা হারিয়ে ফেলে তখন পর্যন্ত তারা তা গোপন রাখে।

বোগ্‌দান শেকলার

পরাগ

ঘন শর-ঝোপের যে সব পাতা পানির উপরে উঠে আছে রোদ পড়ে সেগুলিকে দেখাচ্ছে পানির সবুজ ফোয়ারার মতো। এই ফোয়ারা প্রায় সোজা শূন্যে উঠেছে, তারপর বর্শার সব ফলার আকারে বাঁকা হয়ে মাটিতে পড়েছে। সে আর মাগ্‌দা বিস্তীর্ণ সমতল জমির উপর দিয়ে হেঁটে মাঠ পেরিয়ে এসেছে, এখন বিলের বিরাট চরের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। বিলের পূর্বদিক থেকে বালি এনে এখানে জমা করা হচ্ছে। সাভা নদী থেকে এই বালি আনা হচ্ছে। ওখানে নদীর ধারে "কোলুবারা" ড্রেজিং মেশিন নদী-গর্ভে নিস্কাশন চালিয়ে নল দিয়ে বিস্তীর্ণ খালি জায়গায় বালি আর পানি পাঠাচ্ছে। ওই বালিওয়ালা ফেনায়িত পানির প্রবাহ যেখানে এসে ঘুরপাক খেয়ে পড়ছে সেখানে বিলের মাটি কাদায় ডুবে যাচ্ছে। বেলি আর মাগ্‌দা ওই বালির উপর দিয়ে হাঁটছে, এই বালির অস্থির পিঠে পূবাল হাওয়া আঁকিবুকি-কাটা ছোট-ছোট সব বালিয়াড়ি গড়ে তুলেছে।

বেলি বলে, আমার আগে-আগে হাঁটো, আমি পিছু-পিছু হাঁটছি।

মেয়ে তার কালো চোখে বিস্ময় ফুটিয়ে বলে, সে কী, তুমি আমাকে হাত ধরে নিয়ে যাবে না? তাহলে কিন্তু আমার রাগ চড়ে যাবে বলে দিচ্ছি।

বেলি বলে, যা বলি তাই করো।

কিন্তু কেন?

আমি তোমাকে পরে বলছি। এখন আমার আগে-আগে এক শ গজ মতো হেঁটে যাও। যাও হাঁটো। বালির উপর দিয়ে, সুন্দরভাবে, যেমন ইচ্ছা, সহজভাবে হাঁটো।

মাগ্‌দা বলল রাগের সঙ্গে: ঠিক আছে। কিন্তু তোমাকে আমার পিছু-পিছু দৌড়াতে হবে, এই যে দেখো।

সে রাগ করে কয়েক-পা দৌড়ে গেল। পিছু ফিরে আর দেখল না। তখন সে অচিরে বেশ সুন্দর করে হেঁটে যেতে লাগল।

ওরা মোটামুটি দানিউব নদীর দিকে, দানিউব-সাভার মোহানার দিকে যাচ্ছিল। বেলি এই দৃশ্যটাকে প্রায়ই কল্পনায় দেখত, ঠিক এখন যা দেখছে। মাগ্‌দা নরম পাৎলা পোশাকে, অন্তর্বাস নেই, বালির উপর দিয়ে হাঁটছে। তার পায়ের চাপে বালি সরে-সরে যাচ্ছে, তেতে-ওঠা জুতোর সোল বালিতে ডুবে যাচ্ছে এবং সামনে এগোবার যত চেষ্টা করছে তার জঙ্ঘারেখা তত স্পষ্টরূপে দেখা যাচ্ছে। কখনো কখনো এক-পা মিহি বালিতে একটু বেশি ডুবে যাচ্ছে, তখন সমস্ত দেহ তার সামনে ঝুঁকে পড়ছে, হাত দুটি খাড়া মাথার উপর তুলছে, যেন ধোয়া কাপড় উঁচু দড়িতে মেলে দিচ্ছে। লম্বা উড়ু চুলে তাকে দেখতে হয়েছে অদ্ভুত। কিন্তু বেলি জানে, সুদূর তাদের রহস্য-খানি ওই মেয়েরও মনের ভেতর নাচানাচি করছে।

বেলি বলল, এই! এখানে করবে নাকি? যা কখনো কোথাও করো নি?

দূরে, বালির উপর সে তার বাহু দোলাল, চুলে নাড়া দিল। তার ক্ষীণ কটির চারদিকে তার পাৎলা কাপড় মোচড় খেল, দুই পায়ে আঁটো হয়ে জড়িয়ে গেল।

বলল, তার মানে? না! খোলা জায়গায় প্রেম করার কথা কে কবে শুনেছে?

বেলি বলল, আমি জানি এর জন্যে তোমার একটা ঘর দরকার; বিছানা, টেবিল-ল্যাম্প, দরজায় তালা দরকার। এবং আমার তা নেই। কিন্তু আমার ওই সবই হবে। তুমি জানো, এখন আমার নেই, কিন্তু আমার ও-সবই হবে।

মাগ্‌দা বালির উপর দিয়ে পালাচ্ছিল। বেলি চিৎকার করে বলল, এই যে, এই মিথ্যুক মেয়ে, দাঁড়াও। দৌড়িয়ো না।

মেয়ে পাল্টা চিৎকার দিল: তুমি মিথ্যুক। তুমি আমাকে একটা ঘরে নিয়ে যাও না কেন, একটা ফ্ল্যাটে নিয়ে যাও না কেন? সে তো দূরের কথা, আমরা কিনা এই সাহারার বুকে একে অপরের পিছু ধাওয়া করছি।

আমার ঘর নেই, মাগ্‌দা, সত্যি। কিন্তু দেখে নিয়ো, আমার ঘর হবে। বিনা ভাড়ায় এখন আর ফ্ল্যাট দেয়া হচ্ছে না। কিন্তু আমি উপার্জন করব, যথেষ্ট উপার্জন করব, আমি ফ্ল্যাট পাব, এই যে শুনছ?

না, আমি শুনছি না। ওই কথা আমি অনেক শুনেছি।

সাভা নদীর ওপারে ওই যে পুরনো শহর, শান্ত, অগোছালো, প্রলোভিত করছে। বেলির এখন প্রেম করতে ইচ্ছা করছে। তার ড্রেজিং মেশিন, "কোলুবারা", যা দিয়ে মানুষ খাল-বিল ভরাট করতে শিখেছে, সেই সঙ্গে শহর গড়তে শিখেছে, সেটি এইমাত্র সাভা নদীর তীর ধরে চলে গেল এক নতুন নির্মাণ-ক্ষেত্রে। মাগ্‌দা অনেক দূরে চলে গেছে। বেলি পেছন থেকে চিৎকার করে বলল, এই! দাঁড়াও। আমি তোমাকে ওই রকম পালাতে বলি নি। আমার একটু আগে-আগে চলতে বলেছি যাতে তোমাকে সামান্য দূর থেকে দেখতে পাই, তুমি নাগালের বাইরে চলে গেলে কেমন লাগে দেখতে পাই।

মাগ্‌দা চিৎকার করে বলল, আমাকে ধরো দেখি, বেলি!

ব'লে আবার দৌড়াতে লাগল।

তখন সেও বালির উপর দিয়ে দৌড়াতে লাগল। বালি এখনো নরম হয়ে আছে, বাতাসে উড়ছে, পায়ের চাপে দেবে বসে যাচ্ছে। বালিয়াড়ি সব ইতস্তত রয়েছে। সে একটা থেকে আর একটায় লাফ দিচ্ছিল। এবং ইতিমধ্যেই সে তার মুখের উপরে তার মুখ, তার তপ্ত গলা, তার পুষ্ট কাঁধ, নিতম্বে-নিতম্বে ঘষাঘষি এইসব অনুভব করতে শুরু করেছে।

বেজানিস্কা কোসার দিকে ফাঁকা জায়গায় ইমারতের প্রথম দালান-গুলি উঠছে, ওখানে নতুন বেলগ্রেড একদিন মাথা তুলে দাঁড়াবে, এবং বেলি এখন ওখানেই বালিয়াড়ি সমান করছে। এই মারাত্মক বালি, এই পানি আর নুড়ির তোড় যা বিলের উপর দিয়ে ওই ছাত্র-বসতির দিকে বয়ে গেছে, এ যেন সঙ্গে করে কী এক প্রতিশ্রুতি বয়ে এনেছে, আর তার মাঝখানে এই যে এক গোছা ঘাস ওখানে

মাথা তুলেছে, এই ঘাসের গুচ্ছ যেন সেই সব নির্মাণ-কর্মীর স্মৃতির মিনার, যেন মানুষকে প্ররোচিত, উৎসাহিত করতে চায়।

সে মাগ্‌দাকে গিয়ে ধরবে বলে ঠিক করল।

মাগ্‌দা তার নিচে বালিয়াড়ির উপর বায়ু-তাড়িত বালির গর্তে শুয়ে রয়েছে। সে বলছে, এই যে পাগল, আমার চুলে বালি ভরে যাবে, তুমি আমার কাপড় নষ্ট করবে। ছাড়ো, এই উন্মাদ, ছাড়ো!

বেলি কল্পনা করে নিল, আকাশ তাদের ছাদ, এই পৃথিবীর চার দিক ঘরের চার দেয়াল, ওই যে ওই বিজয়-মিনারের কাছে কোথাও রয়েছে দরজাটি। এবং সে কামনা করল, তারা যেন একটু একা থাকতে পারে। সে তাহলে তার বস্ত্রমোচনের চেষ্টা করবে, তার দেহের উত্তাপের উপরে ওই যে তুচ্ছ দুর্বল বর্মটা, ওটাকে অপসারণ করবে। মাগ্‌দা আত্মরক্ষার চেষ্টা করতে লাগল। হাসতে লাগল। তার গলার ভেতর থেকে নিনাদিত ঘণ্টার কলরোল যেন বেরিয়ে আসতে লাগল। বেলি জানে, এই লড়াইয়ে মাগ্‌দা তার কাছে ধরা দিতেই চায়। তারা ভয়ঙ্করভাবে একে অপরকে আক্রমণ করল, আত্মরক্ষার চেষ্টা করল, পশুর মতো গর্‌-গর্‌ শব্দ করল, একে অপরের উপর থাবা চালাতে লাগল, একে অপরের কাঁধে দাঁত বসাতে লাগল, বাচ্চারা যে-রকম খেলতে-খেলতে করে, পায়ে বুকে কামড়া-কামড়ি করতে লাগল। শেষে বেলি বলল, কী, করব না এখানে? এই! শান্ত হও, অত জেদ করে না।

না, এখানে নয়। ছিহ্‌, এই প্রথম, আর এই বাইরে? খোলা জায়গায়?

প্রথম, না? আমার কাছে ধাপ্পা মেরো না। আমি সব জানি।

যদি প্রথম না হয়, আমার যেন মরণ হয়।

বেলি বলল, এখন পর্যন্ত এই এখানে একমাত্র যে জিনিস প্রেম করেছে, বুঝলে, সে হচ্ছে বিলের মাছ আর ব্যাং।

তুমি মনে করো, যদি হয়, আমরাই হব প্রথম?

নিশ্চয়! নতুন বেলগ্রেডের যত ভবিষ্যৎ বাশিন্দা, যত প্রেমিক, যত বিবাহিত তরুণ, তাদের উপর আমরা টেক্‌কা দিতে চলেছি।

এমনকি যত ট্রাক-ড্রাইভার আর নির্মাণ-কর্মী, আর নির্মাণ-ক্ষেত্রে তাদের কুঁড়ে-ঘরে আনা যত মেয়েমানুষ, তাদের উপরেও আমরা টেক্কা দিতে চলেছি।

আচ্ছা বেশ, ঠিক আছে, তাহলে তোমার যা খুশি তাই করো।

তার কণ্ঠের রূঢ়তায় বেলি বিব্রত হয়ে পড়িল। তার কাঁধে সে হাত দিতে যাচ্ছিল, মাগ্দা চেঁচিয়ে উঠল: না, তোমার কথা আমি শুনব না, বেলি, না, আমি শুনতে চাই না। কেউ আমাদের দেখে ফেলবে। তারা আমার পা দেখে ফেলবে, আমার সব-কিছু দেখে ফেলবে।

কেউ কিছু দেখতে পাবে না। ওই তো চারদিকে মাইলের পর মাইল দেখা যাচ্ছে, তোমার খোলা গা কে কোত্থেকে দেখতে আসছে? ধরো, যদি দূরে কাউকে দেখাও যায়, সে এখানে এসে পড়তে পড়তে সেই অপূর্ব ঘটনাখানা তুমি পেয়ে যাবে, বুঝলে?

মাগ্দা বলল, নির্লজ্জ বাঁদর! না, আমি ও-সব করতে চাই না। না, না। চলো, আমরা যাই।

সে তার তলা থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছিল। অনেকক্ষণ লড়ল, তারপর হাল ছেড়ে দিল।

বেলি বলছিল: এখানে উঁচু-উঁচু বিলডিং উঠবে। তখন এই শহরে দেখা যাবে জনৈকা মাগ্দাকে, তার বাচ্চাদেরকে, রাত্রে আলো, নিয়ন-বাতি দেখা যাবে; পাতাল-পথ, মাথার উপরের পথ, খেলার মাঠ, বাচ্চাদের ঢেঁকিকল, পার্কে অবসরপ্রাপ্তদের বেঞ্চি দেখা যাবে। এখানে অসংখ্য রাস্তার শহর হবে, সেই সব রাস্তার নতুন নাম হবে। মাগ্দা, শুনতে পাচ্ছ, আমরা হব প্রথম! আমরা সেই শহরের ভিত্তির উপরে প্রেম করছি যা এখনো নির্মিত হয়নি, সুতরাং আমরা অবশ্যই প্রথম হব। মাগ্দাই প্রথম নারী যে ভবিষ্যৎ নগরের ভিত্তির বালির উপর শুয়েছে। হ্যাঁ, সে শুয়েছে—সুন্দরী, গরম, ঘামছে, নিটোল বুক, বলিষ্ঠ পেশী, নরম গা। ঠিক যেমনটি হওয়া দরকার।

মাগদা শান্তভাবে বলল, বেলি, চলো যাই। শীত করছে, বাতাস দিয়েছে।

বেলি আশ্চর্য হয়ে বলল, কই, এই গর্তে তো কোনো বাতাস নেই!

মাগ্‌দা বলল, বোকার মতো কথা বোলো না। আমি দেখছি আমার ঠাণ্ডা লাগছে।

সে হামাগুড়ি দিয়ে উঠে আসছিল। এই তার প্রথম লজ্জা, তার থেকে যেন পালাচ্ছিল। তার মনে হচ্ছিল, আকাশ যেন কপালের উপর নেমে এসেছে, তাকে ঢেকে রাখতে চায়। আর বেলির ইচ্ছা করছিল আরাম করে শুয়ে থাকতে, মাগ্‌দার কাঁধের নিচে, তার কানের পাশে, তার গলা ঘেঁষে মাথা রেখে অচেতন হয়ে পড়ে থাকতে এবং ঘুমিয়ে পড়তে, যেন খিল-আঁটা ঘরের ভেতর খাটের উপরেই রয়েছে।

সে একগুচ্ছ ঘাস দেখতে পেল, তাতে মঞ্জরী, রাই-ঘাসের মাথায় যেমন দেখা যায়। লম্বা বুনো ঘাস, ভাগ্যবান ঘাস, এই মরুভূমিতে মাথা তুলেছে।

মাগ্‌দা ভাবছে ঃ একটি বীজ থেকে এখানে এই চারা গজিয়েছে। এই বীজ প্রথম কোনো দূর ফসল-তোলা পাহাড়ি মাঠ থেকে পানিতে ভেসেছে, তারপর ভাসতে-ভাসতে এই মজা জলার চড়ায় আটকে গেছে, তারপর শাখা-নদীর পানি এসে ধুয়ে নিয়ে গিয়ে ফেলেছে নদীর প্রধান প্রবাহে। এখন সেই বীজ এখানে, পাইপের ভেতর দিয়ে পানি আর বালির সঙ্গে এসে পড়েছে, এবং ইতিমধ্যে তাতে পত্রপল্লব গজিয়েছে, এমনকি মাথায় সুগন্ধ ফুল ফুটেছে। লম্বা সতেজ সোজা এই ঘাস, বাতাসে দুলছে।

এই বালিতে এই প্রথম ঘাস গজিয়েছে।

মাগ্‌দা বলল, কাল দুটি ঘাস গজাবে।

বেলি বলল, তারপর আমরা হব তিনজন।

মাগ্‌দা তার কোমরে কেমন ব্যথার মোচড় অনুভব করল। সে কুঁজো হয়ে উঠে দাঁড়াল, পায়ের উপরে তার কাপড় টেনে নিল, দুই হাঁটুর ফাঁকে হাত চেপে ধরল। বলল, বেলি, আমি ঘুমোতে চাই।

এই বালির উপরে তোমার ঘুমোনো ঠিক হবে না। রোদ খুব গরম।

মাগ্‌দা বলল, আমরা এই ঘাসের ছায়ায় ঘুমোব।

বেলি রহস্য করে বলল, চমৎকার আইডিয়া। তথাস্তু। এসো, তাহলে ঘুমনো যাক।

লম্বা ঘাসের পাতা মাগ্‌দার অবিন্যস্ত চুলে এসে পড়ল। কতক-গুলো ফুল থেকে পরাগ ঝরে পড়েছে। ওগুলো মাগ্‌দার পেটের উপর পড়েছে। এই পরাগ-রেণু সামান্যতম বাতাসেও ফুল থেকে ফুলে উড়ে যায়। এই রেণু কখনো এক জায়গায় থাকে না।

বাতাসে ওই রেণু বালিয়াড়ির উপর দিয়ে উড়ে চলেছিল।

বোশ্‌কো দোব্‌রোয়েভিচ

বিক্রয়িকা

শহরটি জমে শক্ত হয়ে গেছে।

শহরের একটি পুরনো ঘুপচি বাড়িতে এক বুড়ো তার শয়ন-শয্যা থেকে ডাক পাড়ছে, লুবিচা. ওঠো, সময় হয়েছে।

উঠোনে একটা কুকুর ডাকছে। ও হচ্ছে জ্যাকি, এতটুকু শীপ-ডগ, পথে-পথে ঘুরে-বেড়ানো মংগ্রেল। বোঝাই যাচ্ছে, শূন্যের নিচে তিরিশ ডিগ্রী ঠাণ্ডায় ওর অবস্থা কাহিল হয়ে পড়েছে।

লুবিচার বুড়ি মার ঘুম ভেঙেছে। সে বলে, ওহ্, একেবারে পাথর-ভাঙা শীত!

বিধবা বড়-বোন বলে. এই যে, বাইরে টয়লেটে যেয়ো না যেন। এই যে, বালতি নাও, দরজার ওদিকে গিয়ে কর্ম সারো। আমি জানি, তোমার ব্লাডারের অবস্থা ভালো নয়।

বাতাসে দুর্গন্ধ। তিনটে বাজতে পনের মিনিট বাকি। এমনকি বৈদ্যুতিক আলো মনে হচ্ছে ঠাণ্ডায় নিভে আসছে।

লুবিচার বয়েস তিপ্পান্ন, অনূঢ়া। ছোট-খাটো দুর্বল মানুষটি। ফোলা চোখ। সে কাপড় পরতে লাগল। একটা অধোবাস, দুটো স্কার্ট, কোমরে জড়াল শাল, তিন-জোড়া মোজা, শীতের বুট।

দরজায় ক্যাঁচ্ করে শব্দ হয়। যতই হোক, লুবিচার বুদ্ধি-বিবেচনা আছে, সে উঠোনের পায়খানাতেই যাচ্ছে।

বুড়ো উঠেছে। তার গরম পদাবরণের ফিতা ঝুলছে, তাই নিয়ে টলে টলে হাঁটছে, বিড়্ বিড়্ করে গাল পাড়ছে, অ্যালার্ম-ঘড়িটা তুলে নিচ্ছে, তারপর শেষ পর্যন্ত অনেক কষ্টে চোখ খুলে কাঁটাটা ছ'টায় নিয়ে যাচ্ছে।

লুবিচা বলে, বাবা, উঠেছ কেন? ঘুমোও।

সে তার বুটের উপর আবার পুরনো একটি মোজা টেনে টেনে ঢোকাচ্ছে, যাতে বরফে পা না হড়কায়।

বুড়ো কম্বলের ভেতরে তলিয়ে যেতে যেতে বলে, উফ্, শীত, শীত !

লুবিচা বেরিয়ে পড়ে। এ হচ্ছে তার বাঁধা নিত্যকর্ম, প্রত্যেক সকালে সে এমনি বেরোয়। একটা ডেইরিতে সে গত চব্বিশ বছর ধরে বিক্রয়িকা। দীর্ঘ পথ। কাঠের ল্যাম্প-পোস্ট। কতকগুলোতে বিদ্যুৎ-বাতি রয়েছে কতকগুলোতে নেই। পায়ের তলায় তুষার আর বরফ কিড়মিড় করে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে। তার হাত দুটি খস্‌খসে মেরে গেছে, ফেটেছে। রাত্রে হাতে লোশন মাখতে কেন ভুলে গিয়েছিল কে জানে। সে তার হাত ঘড়িতে চাবি দেয়। ওটি তার প্রতিষ্ঠান তার চাকরির কুড়ি বছর পূর্ণ হলে তাকে উপহার দিয়েছিল।

বুড়ো ওদিকে বিড়্ বিড়্ করে, হায় বেচারী লুবিচা, তুই কদ্দিন আর টিকবি !

লুবিচার বোন হাঁই তুলতে তুলতে বলে, ওই লোকগুলোর কথা মনে হলে আমার আতঙ্ক হয়।

বুড়ি জিজ্ঞেস করে, কী যেন ওরা বলেছিল ? গত বছর ? শ্রমিক-পরিষদে যখন লুবিচা নির্বাচিত হলো ?

লুবিচার বোন পিঠে পালকের ঢাকা চাপাতে চাপাতে বলে, গোবেচারী ওই মিনমিনে লুবিচা কেমন করে যে কারো বিচার করতে ওঠে, তাই ভেবে আমি আর কিনারা পাই না।

লুবিচার এক সময় মেনেনজাইটিস হয়েছিল। সেই কালে এই রোগের চিকিৎসা ছিল না। ঘটনাক্রমে বেঁচে যায়। সম্ভবত সেই কারণে সে মানুষটাই এমন হয়েছে যে তার মুখে আর চোখে সব সময় দুঃখের এক অস্পষ্ট ছায়া ভেসে রয়েছে। ওই ছায়া বলে দেয় অনেক দিন আগে এই মেয়েটি মারাত্মক ভোগা ভুগেছিল।

ডেইরি ক্রমশ চোখের সামনে ভেসে ওঠে। দস্তানা খোলে। প্রথম চাবিটি ঘোরায়। লোহার খড়খড়ি শক্ত হয়ে আছে। দরজার তালা সহজে খোলে। সুইচ টিপে আলো জ্বালে। দরজায় তালা দেয়। বয়লার চালু করে দেয়। পোশাক ছেড়ে সাদা সুতী স্মক

পরে নেয়। রেফ্রিজারেটার খুলে দেখে নেয় যথেষ্ট পনির আর দই রয়েছে কি না।

ট্রাকের শব্দ এসে থামে। দরজায় টোকা পড়ে। লুবিচা চকিত হয়ে ওঠে। ডেলিভারী-ম্যান বলে, সুপ্রভাত, লুবা।

প্রভাত, বন্ধু।

লুবিচা ওদের তিনজনকেই সুপ্রভাত জানায়। ওরা তিনজনই ম্যাসিডোনিয়ান, ওই ডেলিভারি-ম্যান. ড্রাইভার, বাহক।

ডেলিভারি-ম্যান বলে, লুবিচা, আমার সুন্দরী, হায়, আমারে বিয়া তুমি সত্যি করলা না?

লুবিচা কপট রাগে বলে, এই যে ঘোড়া-নেকো, এসো, এই যে গুনে নাও, তারপর বিদায় হও।

সাদা রুটি – এক-শ ষাট।

ঠিক আছে।

লাল রুটি, ৮০০ গ্রামের – সত্তর।

কোনোটা খোঁটো নি তো? খুঁটেছ নাকি?

ডেলিভারি-ম্যান বলে, হ্, খুঁটছি বই কী?

কফি লাগবে?

ড্রাইভার হাত ঘষতে-ঘষতে, হাতে ফুঁ দিতে-দিতে বলে, না, ধন্যবাদ, লুবিচা। আজও দেরি। ওহ্, কী যে ভয়ঙ্কর আবহাওয়া।

সেই কোন্ ১৯৪৪ সালের কথা। বাড়িতে কত আলোচনা, কত যুক্তি-তর্কের পর বেকারিতে এই কাজের জন্যে দরখাস্ত করেছিল। নতুন বেকারি, তিনজন কর্মী, তাদের দু'জন আলবেনীয়, আলিয়া আর বাইরাম, অন্য জন ম্যাসিডোনিয়ান, দিম্চে। এরা আটা সানত, তাতে হাত পা দুই লাগাত। কাউন্টারগুলির নিচে ছিল ইঁদুরের রাজত্ব, আর রুটির মধ্যে তেলাপোকা, এ ছিল নৈমিত্তিক ঘটনা। দিনে সে দশ ঘন্টা করে কাজ করত, তার মধ্যে দু'ঘন্টা নিয়মিত কাঁদত। মনে হতো, না, এই রকম বেঁচে থাকা, সে কিছুতেই পারবে না। মায়ের "আশ্রম" থেকে ছাড়া পেয়ে ময়লা নোংরা দোকান-ম্যানেজারদের এই দুনিয়ায় প'ড়ে ম্লান ফ্যাকাশে আইবুড়ো লুবিচা

হঠাৎ নিজেকে সম্পূর্ণ নতুন এই কর্মকাণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখল। দীর্ঘ সময় ধরে অক্লান্ত কাজ। অবশ্য নানা রকমের পুরস্কার ছিল, যেমন মজুরি কমে যাওয়া কিংবা সময়ে-সময়ে বোনাস। অনন্ত অসুবিধা। পুরাতন, নূতন, ভীতিকর সব মানুষ। এবং বিরাট টালির ফার্নেস থেকে গায়ের চামড়া ঝলসে-দেয়া গরম। ওই ফার্নেস থেকে দিনরাত লক্ লক্ করে তপ্ত-লাল আগুনের শিখা উঠত।

দরজায় আবার টোকা।

আমরা এলাম গো!

এই যে, তোমরা পেস্ট্রিওয়ালারা সব সময় দেরি করো।

ড্রাইভারটা ট্রাকের দিকে দেখিয়ে বলে, আমার দোষ নাই। বলো, আমি কেন দেরি করব? কিন্তু এই যে এটা জমে বসে ছিল।

আলবেনিয়ানটা শাপ-শাপান্ত করে চলল। বলল, পঁচিশ ট্রে পনির-পেস্ট্রি আর পাঁচ ট্রে মাংস-পাই।

এক সময় লুবিচা এই আলবেনিয়ান আর ম্যাসিডোনিয়ানগুলোকে ঘৃণা করত। তাদের চলন-বলন সবকিছুতেই তার রাগ উঠে যেত। কিন্তু তারপর, সময় বয়ে গেল, তাদেরকে সে আধা-জানা জানত, সেই লোকগুলোকে তাদের অমার্জিত স্থূলতায়, তাদের ঘর্মাক্ত লোমশ বুকের মধ্যে ভালো করে দেখল, জানল। সে গোপনে তার সব কয়জন দোকান-ম্যানেজারকে ভালোবেসেছে, এবং অনিচ্ছার সঙ্গে হলেও, সময়ে-সময়ে তাদের কোনো প্রত্যুষের উদ্বেল বাসনার ক্ষণে নিজেকে মথিত করতে দিয়েছে। সে যেন ঠিক সন্ন্যাসিনীর মতো করুণাময়ী, পরিশ্রমী ছিল। এই সন্ন্যাসিনী অবশ্য এক সময় অনুভব করেছিল, মানবের দেহে কেবল মোমবাতি জ্বলে না, মশালও জ্বলে, আর মশাল তার গোপন কামনাকে পরিতৃপ্ত করে।

পাঁচটা বাজতে কুড়ি মিনিট বাকি। দুধওয়ালার কী হলো? সে একটা বড় ছুরি তুলে নেয়। ছুরির মস্ত থ্যাবড়া কাঠের বাঁট দিয়ে টিপ করে রাখা চৌকুনো কাগজের উপর জোরে-জোরে গোল-গোল দাগ টানে। এই কাগজ দিয়ে এখনি সে মাংস-পাই মুড়বে। কাগজগুলো আলগা হয়ে যায়, এখন ওগুলোকে সহজে ছড়ানো যাবে।

আচ্ছা, ওই যে ওই অর্থনৈতিক সংস্কার, ওই দিয়ে ওরা কী করতে চায়? শ্রমিক পরিষদে দু'জন সদস্য প্রস্তাব করল, রুজা-কে লে-অফ করতে হবে। বাইশ বছর ও ওই ক্যানটিনে গতর খাটাচ্ছে, এখন তার পাছায় লাথি ঝেড়ে বলছ, যাও পথ দেখো। না, কমরেডগণ, এ ঠিক পন্থা নয়। আমি সামান্য এক বিক্রয়িকা, আপনারা কেউ কেউ লেখাপড়া করেছেন, কিন্তু আপানাদের প্রতি যাবতীয় উপযুক্ত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেও, ওই যদি হয় আপনাদের সংস্কার তাহলে আমিই সবার আগে এর বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়াব। ঠিক আছে, দিম্‌চে স্কুলে লেখাপড়া করেছে, তার বিরুদ্ধে আমার কিছুই বলার নেই। কেন, আমি তো ওর বিয়েতে গিয়েছিলাম। ও ওই কাজের উপযুক্ত, বেশ, ওকে ক্যাণ্টিন-ম্যানেজার করে দাও। কিন্তু রুজা-কে তোমরা তাড়াতে পার না। তাকে অন্য কাজ দাও এবং যদ্দিন না তার অবসর হয় তাকে থাকতে দাও।

এসো এসো, নাও, একটু গা গরম করে নাও। এত দেরি যে?

জোরে-জোরে শ্বাস ফেলতে ফেলতে ড্রাইভার বলে, আর বলো কেন। কোনো রকমে এসে পৌঁছালাম, বুঝলে কিনা।

লুবিচা চোখ বড় বড় করে বলে, মাত্র দেড়-শ লিটার দুধ, অ্যাঁ? আর পনের হাঁড়ি দই? বেলা ন'টা অবধিও তো ওই দিয়ে কাজ চালানো যাবে না?

কী করবে বলো, ওই যে দিতে পারছি সেই ভাগ্য।

ড্রাইভার আবার বলে, ও লুবিচা, শ্রমিক-পরিষদে সেই যে আবেদনটা করেছি, ওটার কী যে হলো তুমি একটু দেখো না গো দয়া করে! বলো দেখবে? ছোট বাসটাতে কবে আবার আমাকে ফেরত পাঠানো হচ্ছে? ধরে নাও আমি জেল খাটছি, বুঝলে, কয়েদ খাটছি!

অন্যজন বলে, বুঝলে লুবিচা, যা বলছে বলতে দাও, ওর কথায় কান দিয়ো না। বিশ বছরের ছোকরা, ট্রাক চালিয়ে এর মধ্যে কাহিল হয়ে পড়লেন!

লুবিচার এখানে কাজ করতে প্রথম দিকে ভয়ানক সব ঝামেলা গেছে। ওদের পাশের বাড়ির হিংসুটে এক মেয়েলোক ওদের এই প্রতিষ্ঠানে পরিচালকের কাছে বেনামা সব চিঠি পাঠিয়েছে। তার বক্তব্য সংক্ষিপ্ত। এই লুবিচা পেত্রোভিচ, আপনাদের বিক্রয়িকা, দখলদার আমলে নাৎসী অফিসারদের সঙ্গে শুত, সেই তাকে এমন একটি কমিউনিস্ট প্রতিষ্ঠানে কাজ করতে দেয়া হচ্ছে। আল্লা জানেন, এর পরিণাম কী হতো। বিপণন বিভাগের পরিচালক কমরেড ভুলাদো লুবিচাকে যুদ্ধের আগে থেকে জানতেন, তাই বেঁচে গেছে।

পাঁচটা বাজল। সে দোকানের দরজার তালা খোলে। কংক্রিটের মেঝের কাঠের গ্রিলের উপরে সে ধপাধপ পদাঘাত করে। প্রথম খদ্দের প্রবেশ করে। যাত্রী। হাতে সুটকেস। বলে, ওহ্, খুব শীত।

লুবিচা বলে, হ্যাঁ, বড্ড শীত। আপনাকে কী দেব?

আড়াই-শ গ্রাম মাংস-পাই।

সে যখন রেল-স্টেশনের কাছে কাজ করত, তাদের এক ম্যানেজার ছিল, সেই লোক সবাইকে বলে বেড়াত সে দোকানের জিনিস চুরি করে। সারা জীবন তার এই ধরনের সব লোকের সঙ্গে ঠোকাঠুকি করে কাটল। কিন্তু, তার মধ্যে, একজনের নাম করতে হবে। তিনি হচ্ছেন মারা, কর্মচারী ম্যানেজার। ওই মহিলার নামে তার ইচ্ছা করে মিনার গড়ে দিতে। গুরুতর কিছু ঘটলেই সে তাঁর কাছে যেত। গিয়ে তাঁর কাছে একেবারে অন্তর খুলে দেখিয়ে দিত। তখন সবকিছু ঠিক হয়ে যেত। লুবিচা তাঁর কাছে কোনো দিন জানতে চায় নি কেমন করে তিনি তাকে উদ্ধার করতেন। কিন্তু মারা সব সময় বলতেন, লুবিচা, আমাকে ধন্যবাদ দিতে হবে না, ধন্যবাদ দাও তোমার নিজের কাজকে আর তোমার সততাকে। তোমার মতো কর্মীরই আমাদের বড্ড দরকার। অন্য লোকে তোমার মনের শান্তি নষ্ট করুক, আমরা এ হতে দিতে পারি না।

লুবিচা চিন্তায় এমন মগ্ন হয়ে পড়েছিল যে যাত্রীটির কথায় চম্‌কে উঠল। যাত্রী বলল, একটা দই দেবেন।

এক পুলিশের লোক ডেইরিতে এসে ঢুকল। বলল, প্রভাত, মিস্ পেত্রোভিচ। বুঝলেন, আমার ফ্লু ধরে গেছে।

লুবিচা হাসে। যাত্রীটিকে দই দেয়। পুলিশের লোকটিকে বলে, না না, ফ্লু হলে চলবে না, আপনাকে ভালো থাকতে হবে। আপনার আমার মতো লোকের, বুঝলেন কিনা, অসুখ হতে দেয়া যায় না।

তাপ-প্রবাহ

তখন দুপুরবেলা।

আমরা বাড়ির পাথুরে দেয়ালের ছায়ায় বসে রয়েছি। পাথরের উপর পলস্তরার মতো কিছু লেপা হয়েছে। মা মাঝে-মাঝে দেয়ালগুলি চুনকাম করেন। বাড়ির পেছনে একটা পিপা পোঁতা আছে, ওতে তিনি চুন গোলেন। পিপার কানা অনেক আগেই তার আদি আদল হারিয়েছে। ক্ষয় হয়ে হয়ে এখন এমন হয়েছে যে ছুঁলেই খসে পড়ে। মা তখন ভারি বিরক্ত হন, কারণ চুনের সঙ্গে তখন মাটি মিশে যায়, চুনের সাদা নষ্ট হয়ে যায়, ময়লা হয়ে যায়।

ছায়াটা ধূসর। ওই ছায়াটুকুর মধ্যে আমরা এঁটে গেছি। কেবল আমাদের পা রয়েছে রোদে। পায়ের পাতাগুলোতে ধুলো লেপে রয়েছে, খস্‌খসে হয়ে আছে। অবশ্য ওই ধুলো খারাপ ধুলো নয়। ওতে পায়ের ছাল ওঠে না।

গুমোট গরম। সূর্য যেন শহরের উপর নেমে এসে থেমে গেছে। বাতাস স্তব্ধ হয়ে আছে। আমাদের উল্টো দিকে গোরস্তানে সমাধিশিলাগুলি জ্বলছে। কোথাও একবিন্দু শব্দ নেই। মাটি তেতে গেছে। আমি আমার পা থেকে ধুলো ঝেড়ে ফেলার জন্যে নাড়া দিলাম। ও কাতর শব্দ করছে, পা নড়াচ্ছে। অনন্ত জড়তা যেন আমাকে গ্রাস করেছে। বুঝতে পারছি আমার শরীর দেয়ালের উপরে ক্রমশ নেতিয়ে পড়ছে। দেয়ালটাও গরম।

আমাদের এই বাড়ি থেকে একটা রাস্তা পাহাড়ের নিচের দিকে চলে গেছে। রাস্তাটা সাদা। সেই বর্ষার বৃষ্টির ধারা বয়ে যাওয়ার দাগ এখনো রয়েছে। বর্ষায় এই রাস্তা অবশ্য সাদা ছিল না, লালচে আর এঁটেল ছিল। পাথরের খনির দিক থেকে এসে আইভি লতায় ছাওয়া গোরস্তানের পাথরের বেড়াটার দিকে পানি গড়িয়ে যেত, তার ফলে রাস্তায় ফাটল ধরত। আমরা ছোট ছোট বালির বাঁধ বানাতাম, তারপর বৃষ্টিতে ভিজে পেছনে পানির দাগ ছড়াতে ছড়াতে বাড়ির দিকে দৌড়

লাগাতাম। ওই রকমের দিনগুলোতে রাস্তাটা নিচে পুলের ধারে গিয়ে শেষ হয়। ওটা শেষ হয়েছে এই দিকে, পাথরের খনির ধারে, ওখান থেকে শহরের দিকে দ্রুত নেমে গেছে। গাড়িতে করে শহরের দিকে পাথরের চাং নিয়ে যাওয়ার সময় গাড়োয়ানদেরকে বলদের পাশে-পাশে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে হাঁটতে হয়, তখন তারা গালাগাল করে, অভিসম্পাৎ দেয়। সেই রাস্তা এখন সাদা হয়ে নীরবে পড়ে রয়েছে, ভীরু বাতাসের পর্দা যেন তার উপর উড়ছে।

আমি নড়ে-চড়ে বসলাম। আমার ভাইটা ঢুলছে আর মাঝে-মাঝে পা দিয়ে বালি সরাচ্ছে। সে সমানে ঘেমে চলেছে।

বললাম, চলো, সাঁতার কাটি-গে।

সে কথা কয় না। তখন সে আঙুল দিয়ে মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে বলল, তোদের পানিতে বঁড়শি পেতে রেখেছে, আমি সাঁতার কাটব না।

আমি আমার ত্বকের নিচে ঘামের সঞ্চরণ অনুভব করলাম। বললাম, চলো, তাহলে স্লুইস গেটের কাছে যাই। ওখানে নিশ্চয় বঁড়শি ফেলে নি।

ওকে বোঝাবার খুব চেষ্টা করলাম, যদিও জানি, তাতে কাজ হবে না। তখন ভাবছি ও বুঝি উঠে এখন বাড়ির পেছনে লতাগুল্মের বেড়ার ওই দিকে যাবে। ওকে কেউ কিছু করতে বললে ও তাই করে। মা যদি ওর দিকে পানির জগটি তুলে ধরেন, ও কিছু বলবে না, আস্তে আস্তে ওই বেড়ার দিকে চলে যাবে। আমি তো ওর বড়, তবু ওই লতাগুল্মের বেড়ার পথে ও যে কী পায় আমার কাছে সেটা রহস্যই রয়ে গেল। প্রায়ই সে ওখান থেকে ভাঙা কাচ, চামচ, টিন এই সব জিনিস কুড়িয়ে এনে, যেন কোন্ সাত রাজ্যের ধন পেয়েছে, আমার সামনে রাখবে। আমি হয়তো সেগুলিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছি, তখন ওর মুখ উজ্জ্বল এবং আরো লাল হয়ে উঠবে। তখন আবার ওগুলোকে তুলে নিয়ে চলে যাবে।

বললাম, বোসি হয়তো বঁড়শি তুলে নিয়ে চলে গেছে।

কিন্তু সে নড়ল না। রোদ আরো চড়া মনে হলো। বাতাস ভারি হয়ে উঠল। নাহ্, আর সহ্য হয় না।

বললাম, যাবে না?

মাথা নেড়ে বলল, না।

ওর কপাল বেয়ে ঘাম ঝরছে। ঘাম মোছারও চেষ্টা করে না। চোখ বন্ধ করে নিজেকে রোদের মধ্যে ছেড়ে দেয়।

তখন মা-কে পথে ওই নিচে দেখা গেল। আস্তে আস্তে হাঁটছেন। এত আস্তে যে মনে হয় এক জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন। সূর্য জ্বলছে। মায়ের মাথায় কালো রুমাল। আমরা উঠে দাঁড়ালাম, পরনের প্যাণ্ট ঝাড়লাম।

মা দরজার কাছে এলেন, দরজা ধরে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে তার পর বসে পড়লেন। জোরে-জোরে শ্বাস পড়ছে। হাত দুটি হাঁটুর উপর এলিয়ে পড়ে রইল।

মা ক্লান্ত স্বরে বললেন, কী গরম! আমাকে এক গেলাস পানি দে তো বাবা।

পানি খেলেন আস্তে আস্তে, চিবুক বেয়ে ক'ফোঁটা গড়িয়ে পড়ল, সাদা দাগ পড়ে গেল। (মুখটি তাঁর কয়লার গুঁড়োয় ছেয়ে আছে।) মুখ মুছতে মুছতে আমার দিকে তাকালেন। তাঁর কোটরগত চোখ-দুটিতে কেমন যেন আলো ফুটে উঠল। একগোছা কালো চুল কপালে এসে পড়ল।

তিনি বিশ্রাম নিতে থাকলেন।

আমার ভাই হঠাৎ নরম গলায় বলল, চলো বাতো, উপরে যাই। তোমাকে একটা জিনিস দেখাব।

ও চলেছে আগে-আগে। বলল, নতুন একেবারে নয়, কিন্তু বাজবে।

চিলে-কোঠার অন্ধকারে গিয়ে সে ঢুকল। জায়গাটা বোলতার চাকে ভর্তি। বোল্‌তাগুলো ভোঁ ভোঁ করছে। ভীষণ গরম। মনে হচ্ছে ছাদের টালি ভেদ করে রোদ ঝরে পড়ছে। আমি চোখ রগড়ালাম। ক্রমে অন্ধকার সয়ে গেল। এখানে ওখানে অন্ধকার ভেদ করে ধূলোটে আলোর রেখা প্রবেশ করছে। দেখি ও এক কোণে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

কাণ্ড দেখে আমি তো তোতলাতে লেগে গেছি। বললাম, আরে, এ যে দেখি গিটার?

সে আমার দিকে ওটা এগিয়ে দিল। মুখ ফাঁক করে হাসছে। বলল, নাও, তুমি নাও। তুমি আমার চেয়ে বাজাও ভালো।

খুব যত্ন করে সে ওটি আমার হাতে তুলে দিল। আমরা বসে পড়লাম। তারগুলিকে ছুঁলাম। শব্দ ছড়িয়ে পড়ল। যেন আমাদের অভ্যন্তরে গিয়ে তার প্রতিধ্বনি উঠল। ও বিড় বিড় করে বলল, বাজছে, বাজছে! দেখো, বাজছে!

আবার বলল, এই যে শোনো, বুঝলে, জোলি যেমন বাজায় সেই রকম করে বাজাও।

আমি তারে আঘাত করতে লাগলাম। আমাদের চিলে-কোঠা গিটারের ধ্বনি-প্রতিধ্বনিতে ভরে গেল। ও আমার দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগল। সূর্যরশ্মির রেখাগুলি দুলতে লাগল। বোলতারা সমানে ভোঁ ভোঁ করে চলল।

তুমি এটা সত্যি আমাকে দিচ্ছ? ইয়ার্কি করছ না তো?

আরে না, ওটা তোমার। নাও, বাজাও, বাজাও!

মনে হলো আমার বুক যেন এই এত বড় হয়ে গেছে। গিটারের গায়ে আমি আদর করে হাত বুলোতে লাগলাম। এটা তাহলে আমার। এই প্রথম এই জিনিস আমি আমার একেবারে নিজের করে পেলাম। আগে আমরা লাল্কোর চারদিকে বসে তার বাজানো শুনতাম। আমাদের মধ্যে কেবল ওরই গিটার ছিল। আর এখন কিনা আমি এখানে এই গিটার নিয়ে বসে রয়েছি। এটা এখন আমার, কেবল আমার।

জ্বল্জ্বলে চোখ মেলে ওর দিকে তাকিয়ে বললাম, মা-কে গিয়ে দেখাই?

দেখি মা সেই একভাবে বসে রয়েছেন। ঢুলছেন। কাছে গেলাম। বললাম, মা, এই যে দেখো, একটা গিটার পেয়েছি।

আস্তে আস্তে তিনি চোখ খুলে আমাদের দিক তাকালেন।

কোথায় পেলে?

ভাইটিকে দেখিয়ে বললাম, ও আমাকে দিয়েছে।

আমাদের দিকে চিন্তিতভাবে মা তাকালেন। আমার ভাই বলল, আজ সকালে লাল্কো এটা আমাকে দিয়েছে!

তিনি বললেন, খালি তো শুনি, বলো, আমরা গিটার বাজাতে পারি। কই বাজাও দেখি। দেখি কেমন বাজাতে পারো।

যাতে ভালো করে আমাদের দেখতে পান, তাই নড়ে-চড়ে বসলেন।

আমি তারে আঘাত করতে লাগলাম। আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বাজাতে লাগলাম। শব্দ আরো পরিপূর্ণ হয়ে উঠল, এবং আরো ঝঙ্কার তুলল। ভয়ানক উৎসাহের সঙ্গে বাজিয়ে চললাম। মা হাসলেন, আমার ভাই ফাটা মাটির উপর পা ঘষে চলল।

সেদিন আমি বহুক্ষণ ধরে বাজালাম। এবং অতঃপর, মা খনি থেকে ফিরে এলেই বাজাই। লাল্‌কো প্রায়ই আসে। ওরা সবাই আমার বাজানো শোনে এবং ঠোঁট নাড়ে। আমার মুখ লাল হয়ে ওঠে।

তারপর যখন গ্রীষ্মকাল শেষ হলো, শহরের উপরে ভারি কালো মেঘ ভীড় জমাল, তখন আমি গিটার বাজানো বন্ধ করলাম। গোরস্তানের উপরে গুঁড়ি-গুঁড়ি বৃষ্টি পড়তে লাগল, কুয়াশায় ওখানটা ঢেকে গেল। মা মুখ ধুচ্ছিলেন। তিনি বাড়ির সামনের মাটিতে সেই কালো, ফেনা-মাখা পানি হাত বাড়িয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। পানি মাটিতে ছড়িয়ে পড়ে বৃষ্টির সঙ্গে মিশে গেল।

কাবার্ড থেকে কী একটা বের করে তিনি বললেন, শহরে সার্কাস এসেছে।

বললাম, মা, আমরা দেখব। আমাদের নিয়ে চলো।

বললেন, তাহলে তৈরি হও। আমি গিয়ে পানি নিয়ে আসি।

ব'লে বেরিয়ে দরজা বন্ধ করে চলে গেলেন। আমি জুতো পরতে লাগলাম।

বাতো, আমাকে তোমার জ্যাকেট পরতে দেবে?

বললাম, না।

ও আবার বলল, কেন, কী হবে? দাও না।

আমি ধমক মেরে বললাম, বলেছি না দেব না?

ঠিক আছে। কিন্তু ভুলে যেয়ো না আমি তোমাকে গিটার দিয়েছি। আমাকে পরতে দাও। মাত্র আজকে। তুমি কালোটা পরো। তোমার তো কোনো ক্ষতি হচ্ছে না।

না, আমি দেব না।

ও তখন চিৎকার করে বলল, তাহলে আমাকে আমার গিটার ফিরিয়ে দাও।

ব'লে বিছানা থেকে সে ওটা তুলে নিল।

আমি ছুটে গেলাম। ও গিটার শক্ত করে ধরল। আমি টান লাগালাম। পুরনো গিটারটা মেঝেতে পড়ে গেল, টং করে একটা ভোঁতা মতো শব্দ হলো। আমি ওটাকে ধরে টানাটানি করতে লাগলাম। টেবিলের দুই পায়ার মাঝখানে ওটা আট্‌কে গিয়েছিল, প্রথমে চিড়্ ধরল, তারপর ফেটে গেল। ও উল্টো দিকে মুখ ফিরিয়ে ছিল। গিটারের যেটুকু অবশিষ্ট ছিল শক্ত করে ধরে ওর পিঠে মারলাম। ও ব্যাথায় ককিয়ে উঠল। তারপর আমাকে ঠেলে সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করল। একটা তার ওর পিঠে জড়িয়ে গিয়েছিল। ও চিৎকার করে কেঁদে উঠল, চোখ ফেটে ওর পানি পড়তে লাগল। ভাঙা যন্ত্রটা মেঝেয় ফেলে দিলাম। চেয়ারের পিঠে আমার জ্যাকেটটা রেখেছিলাম, তুলে নিলাম। শক্ত করে ধরলাম।

মেঝের দিকে দেখিয়ে বললাম, ওই যে, নাও তোমার গিটার।

সে কাঁদছিল। তার কাঁধ কাঁপছিল। আমার দিকে না তাকিয়ে সে হাঁটু গেড়ে বসল, গিটারের ছড়ানো অংশগুলো কুড়াতে লাগল। আমি তার মাথার উপর চুপচাপ গিয়ে দাঁড়ালাম। তার মোটা-মোটা গাল-দু'টির উপর দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল। সে কেঁদেই চলেছে। ঠোঁট দুটি কাঁপছে। আমি জানি ওর পিঠের ব্যথার জন্যে ও কাঁদছে না। চোখ বড় বড় করে ভাঙা টুকরোগুলো আমার দিকে তুলে ধরে তোতলাতে তোতলাতে বলল, বাতো, তুমি এটা ভাঙলে কেন? কেন ভাঙলে?

কান্নার মধ্যে তার বাকি কথাগুলো হরিয়ে গেল।

আমি পুরনো কালো জামাটা শক্ত করে ধরলাম। চোখ-দুটো ওর লাল হয়ে উঠেছে। তখন আমার ভিতরে যেন কিছু ভাঙচুর হচ্ছে। তার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে ইচ্ছা হলো ক্ষমা চাই। কিন্তু কেবল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম। তারপর পেছনে জ্যাকেট ঝুলিয়ে বেরিয়ে

পড়লাম, জ্যাকেটটা পিঠের উপর ক্রমাগত ভারি হয়ে উঠতে লাগল। ওর কান্না আমার পিছু ধাওয়া করে আসতে লাগল।

অমাার জ্বলন্ত মুখ বৃষ্টিতে ভিজতে থাকল। হাত থেকে জ্যাকেট পড়ে গেল। পাহাড়ের নিচের দিকে হাঁটতে লাগলাম।

ওই সন্ধ্যায় আমাদের সার্কাসে যাওয়া হয় নি। সে আপন মনে সারা রাত কাঁদল, গুন্ গুন্ করে কাঁদল। মায়ের মুখে কোনো কথা নেই। সামনে শূন্যে তাকিয়ে থেকে তিনি বাতি জ্বাললেন। আমার বুকের ভেতর কিছু যেন মাথা তুলছে, আবার মাথা গুটিয়ে নিচ্ছে।

বললাম, আমি লাল্‌কোর কাছে যাচ্ছি।

কেউ কিছু বলল না। এমন কি আমার দিকে কেউ তাকাল না।

ওই সন্ধ্যায় লাল্‌কো আমাকে ঘটনাটা বলল।

বলল, আমরা বাজি ধরেছিলাম, বুঝলে। বাজি ধরার কথাটা ওই বলেছিল। বুদ্ধিটাও ওরই—তিন কলসি পানি। বুঝলে, খেতে হবে এক টানে। ওই যে, ওই ওখানে, কুয়োর ধারে। ও বাজি জিতল। কী করা, ওটা ওকে দিয়ে দিলাম, ও বাজি জিতেছে। তুমি হলে পারতে না। আর ও কিন্তু ওর নিজের জন্যে ওটা চায় নি। তোমাকে তাক্ লাগাবার জন্যে চেয়েছিল। ও জানে তুমি বাজাতে ভালোবাসো। তোমাকে নিয়ে ও গর্ব করে, সত্যি গর্ব করে। সব সময় ও তোমার কথা বলে।

আমার গলায় কী যেন একটা নিচের থেকে উঠে এল। টের পেলাম চোখ পানিতে ভরে উঠছে। আমি কাঁদছি কিন্তু শব্দ নেই। বৃষ্টির ফোঁটা আমার মাথার উপর ঘুরপাক খেয়ে খেয়ে ঝরে পড়ছিল, কাঁধ বেয়ে গড়িয়ে যাচ্ছিল। ধীরে ধীরে হেঁটে চলেছি। তখন টের পেলাম আমি অসুস্থ।

বৃষ্টিতে আমার পিঠ ভিজে চলল।

ভোয়িস্লাভ জোরিচ

প্রবীণদের লীগের কাছে পত্র

আমি আমার নিজের জীবনের এবং আমার পরলোকগত বাবার মৃত্যুর পরের জীবনের সামান্য একটু অংশের গল্প আপনাদের শোনাব। এই গল্প আপনাদের শোনানোর মাত্র এইটুকুই কারণ যে আপনারা তাঁর পুরনো কমরেড। একটা কথা প্রথমেই স্পষ্ট বলে রাখিঃ আমি আপনাদের কাছে কোনো সাহায্য টাহায্য প্রার্থনা করছি না। সুতরাং যদি কোনো টাকা-পয়সার কথা উল্লেখ করি, জানবেন, না ক'রে উপায় নেই ব'লে করেছি। আপনারা কেবল পড়ুন। পড়লেই দেখতে পাবেন কী নিয়ে এই গল্প।

পেশায় আমি মিস্তিরি। এখানে এই জার্মানিতে তা ছ'বছর হয়ে গেল কাজ করছি। প্রথম দিকে, এখানকার ভাষা জানতাম না বলে এমন সব কাজ পেতাম যাতে আমার কেবল মনে হতো, যাই দেশে চ'লে। জানতাম না কোথায় যাব, তবু মন চাইত প্রথম যে ট্রেন পাই তাতেই চড়ে বসি, এবং সেটা যদি মাল-গাড়িও হয়। তখন একদিন বউকে বললাম, জানি না আমার কী হয়েছিল, বউকে জিজ্ঞেস করলাম, দেশে, মিষ্টি সুন্দর মনোরম আমার দেশে ফেরার টিকিটের মতো পয়সা হয়েছে কিনা। জানেন সে কী করল? কেবল হাসল। কিন্তু বিষাক্ত ভিমরুল ছিল সেই হাসিতে, সেটা উড়ে এসে আমার বুকে হুল ফুটিয়ে দিল। ওই ভিমরুল যেন বলল, কেন, তোমার সাধ এখনো মেটে নি? তোমার সেই পুরনো যুগোস্লাভিয়াকে তোমার আর কী দেয়ার আছে? আমি আমার ওই কথার জন্যে দুঃখ প্রকাশ করলাম, কিন্তু তখন দেরি হয়ে গেছে। গুলী যখন ছোঁড়া হয়ে গেছে, আর তো গুলী ফিরিয়ে এনে নলের মধ্যে ঢোকাতে পারি না। যাই হোক, এ-সব কথা বলে এখন আর লাভ নেই। হাসির ভিমরুল হুল ফুটিয়ে দিয়ে চলে গেছে, বুকের ভেতর তার যন্ত্রণা বেজে চলেছে। তাছাড়া, ওই যন্ত্রণা এত গভীরে যে ওর নাগাল পাওয়া দুঃসাধ্য, ওতে যে ঠাণ্ডা সেক দেব সে সম্ভবই নয়।

অতএব, সোজা কথায় বলতে গেলে, আমি থেকে গেলাম, এবং এখনো এখানে আছি।

তার পরের দিনগুলোতে অবশ্য হৃদয়ের সেই যন্ত্রণা কমে গেল। আমি ভাষা শিখে ফেললাম এবং কাজ করে চললাম। শেষ পর্যন্ত, এই গত বছরের কথা, এমন হলো, একসঙ্গে দুই জায়গায় কাজ মিলে গেল। একটা ক্রুপ কোম্পানিতে, অন্যটা বৃহৎ ওপেল সার্ভিস স্টেশনে।

ওই গ্যারাজের কাজটা নেয়াই স্থির করলাম। ক্রুপে কাজ করতে মন চাইল না। মন চাইল না বাবার কারণে, কামানের সেই গোলার কারণে যেটা ত্রিয়েস্তে মুক্ত করার সময়ে বাবার কাছে পড়েছিল।

আমি এখন যেখানে কাজ করি, আমার সেই নতুন মালিক প্রায় আমার বয়েসী। চুক্তি সই হলে সে বলল, জানো, আমাকে একজন বলেছে, তুমি এক বিস্ময়কর কর্মী।

বললাম, ভালো, যতদিন না অন্য রকম দেখো, সেই লোকের কথা বিশ্বাস করে চলো আর কী।

তুমি কি জানো কেন তোমাকে আমি নিলাম?

মনে হয় আমার ভালো সুপারিশ ছিল বলে?

সেটা একটা কারণ বটে।

আমার মনে হয় ওটাই প্রধান কারণ।

হ্যাঁ, ওটাই প্রধান কারণ। কিন্তু তুমি যুগোস্লাভও বটে।

ওহ্, ধন্যবাদ। তুমি তাহলে যুগোস্লাভদের পছন্দ করো?

আমার বাবা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে মারা যান।

ওই ঘটনার জন্যে আমি দুঃখিত। আসলে এই দুনিয়ায় যখন যেখানে যে যুদ্ধ হয়েছে, সাধারণভাবে তার প্রত্যেকটার জন্যে আমি দুঃখিত।

আমার নিজের বাবার কথা আর আমি তাকে বললাম না। সে বলল, আমি তোমাকে ওই কারণে চাকরি দিই নি। তোমার তো কোনো দোষ নেই।

তুমি কী চাও আমাকে পরে বলতে পারো। আমি অপেক্ষা করব।

আমি তাঁর কবর খুঁজে বের করতে চাই। তিনি ইস্ত্রিয়ার কাছে কোথাও যুদ্ধ করেছিলেন। তুমি কি আমাকে সাহায্য করতে পারো?

আমি ঠিক ওই অঞ্চলের লোক নই। তবে আমি চেষ্টা করব।

পাঁচ মাস ধরে "সন্ধান" চালানোর পর আমি তাকে ত্রিয়েস্তের এক লোকের ঠিকানা দিলাম, সে তাকে আমার বাবার কবর দেখিয়ে দিল। এতে আমার খরচ হয়েছিল ৫০,০০০ লিরা। এবং আমার বাবা জার্মানিতে নীত হলেন। অবশ্য আমি জানি আপনাদের ভয়ানক কৌতূহল হচ্ছে কেমন করে এ সম্ভব হলো সেই জিনিসটি জানতে। ওইসব বর্ডার-টর্ডার পেরিয়ে, কাস্টমসের পরীক্ষা পেরিয়ে কেমন করে এ সম্ভব হলো? সত্যি বলতে কী, আমারও ওই জিনিস জানতে খুব ইচ্ছা হয়। আমার পিতামহ, যদি বেঁচে থাকতেন, একমাত্র তিনিই এ-সম্পর্কে বলতে পারতেন। তিনি এমন সব মানুষকে জানতেন যারা অনায়াসে ঘাড়ে ধরে একটা বিড়ালকে একজায়গা থেকে আর এক জায়গায় নিয়ে যেতে পারে কেবল যদি ওই বিড়ালের গলায় কয়েকটা মুদ্রা বাঁধা থাকে। কখনো কখনো আমার মনে হয়, এই টাকা আমাকে নষ্ট করেছে, এমনকি, ধরে নিলাম, এই টাকা যদি পুরাদস্তুর বৈধ হয় তবু। যাক্‌গে, ওই কাণ্ড কেমন করে সম্ভব হলো তাই নিয়ে আমি আর মাথা ঘামাতে চাই না। সহজ সত্যটা হচ্ছে আমার বাবা নিশ্চিতই এখানে রয়েছেন, এই হ্যানোভার গোরস্তানে। আমি এই সত্য প্রমাণও করতে পারি। আমি আপনাদের এ-সম্পর্কে বলছি যাতে আপনারা জানেন যে আইন যদি এটাকে অপরাধ বলে, আমি তার উত্তর দিতে প্রস্তুত রয়েছি।

আপনারা ভাবছেন আমি অবশ্যই এই লোকটাকে ঠকিয়েছি। কিন্তু আপনাদের এ-কথা ভাবার একমাত্র কারণ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন না সে কত খুশি। যে লোক সব ঘটনা জানে না সে মনে করতে পারে, আমি আমার বাবাকে নিয়ে নোংরা চাল চেলেছি। কিন্তু তিনি তো বিদেশে ছিলেন, হ্যাঁ, বিদেশে ছিলেন, অন্তত এখন তিনি আমার কাছে আছেন। আমি অবশ্যই স্বীকার করব, আমাদের দু'জনের যে এখন ওই এক বাবা এই ঘটনাটার মধ্যে আমি কোনো অন্যায় দেখি না, যদিও এটা শতকরা এক শ' ভাগ বৈধ না হতে পারে। আমি যা করেছি তার সাফাই গাইছি না। একটু প্রতারণা, তা, হয়েছে বই কী। আর এই জিনিসটাও ঠিক সুখকর হয় না যখন রবিবার

আমাদের দু'জনের এক সময়ে গোরস্তানে গিয়ে দেখা হয়, হাতে থাকে ফুল, চারদিকে থাকে মৌনতা।

সে আমাকে ধন্যবাদ দিয়ে বলে, এর জন্যে তোমার কোনো দোষ নেই।

আমি বলি, তোমারও কোনো দোষ নেই।

ব'লেই ভাবি, আমার এই উত্তর নিশ্চয় তার কতই না উদ্ভট মনে হচ্ছে।

সে বলে, তুমি আমাদের ভাষার সব সূক্ষ্ম ব্যাপার এখনো শিখতে পারো নি।

এই কথা ব'লে সে-ই আমার হয়ে অজুহাত তৈরি করে, তারপর আমার বাবার বুকের উপর লাল কারনেশন রাখে।

তার কথায় সায় দিয়ে আমি বলি, আমি কিছু-কিছু সূক্ষ্ম ব্যাপার শিখেছি, কিন্তু ওই সব সূক্ষ্ম ব্যাপার তোমাদের কতই না আছে!

তারপর আমার কারনেশনগুলি তারগুলির একটু উপরে রাখি যেখানে বাবার মাথা থাকার কথা।

শেষে আমরা খুব নম্রভাবে একে অপরকে সুবিদায় জানাই এবং যার-যার পথে চলে যাই। এবং প্রত্যেক রবিবার এই জিনিস ঘটে।

আশা করবেন না আমার প্রত্যেক কাজের পেছনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করা আমার পক্ষে সম্ভব। এমনকি চিন্তা হয়, আমার ছেলে যখন বড় হবে তাকে আমি এর ব্যাখ্যা দিতে পারব কিনা। অবশ্য আমি জানি আমাকে সে-কাজ করতেই হবে। ওর বয়েস এখন ছয়। অতএব আপনারা নিশ্চয় ভাবছেন আমার যথেষ্ট সময় আছে। ও এইখানে জন্মেছে এই কথা শুনে হয়তো আপনারা অন্য রকম ভাববেন। আমার ছেলে জার্মান রুটি খায়, এবং তার ছোট পেটটির ভেতর হজম হয়ে গিয়ে তা তাকে বাড়তে সাহায্য করে। এই সুন্দর সুশৃঙ্খল দেশের দৃশ্যাবলী সব সময় তার চোখের সামনে রয়েছে এবং ওইসব জিনিস ও এখন ভালো করে দেখতে শিখছে, ওই সবই ওর শৈশবের স্মৃতি হতে চলেছে। যে-সব জার্মান শব্দ সে ইতিমধ্যে শিখেছে এবং যা সে স্কুলে গিয়ে শুনবে, তার ক্ষুদ্র মনে, ওই মন ঠিক যেমন-যেমন গড়ে

উঠবে, তাতে গেঁথে যাবে। আমি জানি, এইসব নিয়েই হচ্ছে সেই যে সেই শব্দ ঃ "স্বদেশভূমি"। সেই কারণে আমার ভয় হয়, না, আমি হয়তো বেশি সময় পাব না ; যদিও, সময় যাই থাকুক না কেন, ওর উচিত আমাকে আর ওই শব্দটাকে ঠিক-ঠিক বোঝা। কারণ আমি তো এখানে ওর জন্যেই এসেছি।

বলছিলাম "স্বদেশভূমি"র কথা। হয়তো আপনারা ভাবছেন আমি নিজে ওই জিনিসের সামান্য একটুখানি এখানে পেয়েছি। দেখুন, এই কারণেই এই চিঠিখানা লেখার ব্যাপারে আমি ইতস্তত করেছিলাম। তবু, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, আমি এটা লিখে ফেলেছি। লেখার কারণ আর কিছুই নয়, সাক্ষ্য হিসাবে আর আপনাদের রেকর্ড-পত্র ঠিকঠাক করার জন্যে এর দরকার হতে পারে।

যদি বড্ড বেশি কথা বলে থাকি, আমাকে মাফ করবেন, এবং জার্মানি থেকে আমার কমরেড-সুলভ অভিনন্দন গ্রহণ করবেন।

মিল্‌কা বুন্‌য়েভাচ-গ্রুয়োভিচ

১৪ নম্বর কক্ষ

কতকগুলি পপলার গাছের মাঝখানে আশ্রমটি স্থাপন করা হয়। এক সময় এটির নাম ছিল এগবার্গ ভিঁলা। নদীর ধারে গাছের আড়ালে অনেকগুলি ভিলা ছিল, এটি তার একটি।

আলেনকাকে যেদিন ওরা এখানে নিয়ে এল তখন ওই গাছগুলির পাতা ঝরে গেছে, নদীর পানি জমে গেছে। সে যুদ্ধে তার বাবাকে হারিয়েছে। আশ্রমে একটি গাড়িতে করে ওকে আনা হলো। যে অফিসারটি ওকে ওর দেশের বাড়ি থেকে নিয়ে আসছিলেন তিনি ঢোকার সময় মাথা তুলে দেখলেন, লেখা রয়েছে, 'শিশু-আশ্রম'।

আলেনকা স্তেশিচ এই নামটি যে লোকটি খাতায় তুললেন তাঁর একটি চোখ পাথরের। সত্যি, যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর খুব বেশি সময় গত হয় নি।

আলেনকার উপর সন্ধানী দৃষ্টি বুলিয়ে তিনি বললেন, তুমি তোমার নিজের সবকিছু এখানে পাবে, মনে হবে নিজের বাড়িতেই আছ। এটা অন্য জায়গা, অন্য রকম জায়গা এই কথাটাই ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করবে। তুমি বই পাবে, তোমার নিজের বই। খাওয়ার ঘরে তুমি একটি ব্যাগ পাবে আর একটি জায়গা পাবে। ওই জায়গাটি তোমার জন্যে বাঁধা থাকবে। তুমি এগারো নম্বর ডরমিটরিতে শোবে। মাসে একবার তোমাকে কাজ দেয়া হবে, তখন তোমাকে টেবিল সাজাতে হবে, এঁটো পরিষ্কার করতে হবে। প্রত্যেকের এখানে যার-যার বাঁধা পদ রয়েছে, সব সময় তোমাকে জেনে রাখতে হবে কে কর্মচারী, কে কাউন্সিলে রয়েছেন, কে ব্রিগেডে রয়েছেন। একেই বলে আশ্রম, বুঝলে? তুমি ক-দের সঙ্গে তৃতীয় ব্রিগেডে থাকবে। তোমার যারা বড় তাদের প্রত্যেককে মান্য করতে শিখতে হবে। আর কী কী শিখতে হবে শোনো। সেমোলিনা খেতে, আলুর খোসা ছাড়াতে, নিজের বিছানা করতে আর ঘরের অন্ধি-সন্ধিগুলি ঝাড়ু দিতে শিখতে হবে। এখানে সব ছেলেমেয়ে ওই সব কাজ করে। সার্বিয়ায় এটাই হচ্ছে সবচেয়ে ভালো শিশু-আশ্রম। এই মুহূর্তে গোটা স্কুলে

আমাদের মাত্র একজন ছ রয়েছে, আর সেও ওই তোমার কেবল ছবি-আঁকার জন্যে, আর মিলান পেচিচ ওখানে খুব দ্রুত শুধরে উঠছে, আমরা সবাই ওর দিকে নজর রেখেছি।

আলেনকাকে রেখে অফিসারটি চলে গেলে একা-একা দাঁড়িয়ে সে কান্নায় ভেঙে পড়ল। তার চারপাশে ক্লাসরুমগুলি থেকে কেবল ছেলে-মেয়েদের গুনগুনানি ভেসে আসছে। ক-দের ক্লাসে কেমন করে যাবে, তাদের সবার সঙ্গে কেমন করে বন্ধুত্ব করবে? তাদের নাক-সিঁটকানি, ঘৃণা, গাল-মন্দ, মারধোর এই সবের হাত থেকে সে কেমন করে রক্ষা পাবে?

কিন্তু আসলে ঘটনা হচ্ছে দীন হীন অবস্থা থেকে গিয়ে শাসন-শৃঙ্খলার মধ্যে পা রাখা এমন কিছু কঠিন কর্ম নয়। দিন গিয়ে মাসে পড়ল, মাস বছরে পড়ল। কষ্ট, ভর্ৎসনা, নীরব দুর্ভোগ, পড়াশোনা, অশ্রু ও প্রশান্ত আনন্দের ভেতর দিয়ে একটি একটি করে বছরগুলি পার হতে লাগল। এক সকাল অন্তর অন্তর সে সেমোলিনা খেতে শিখল, যেন শুকনো শুয়োর-মাংসই খাচ্ছে। সৈনিকদের মতো নিজের বিছানা করতে এবং ঘরের যত অন্ধি-সন্ধি ঝাড়ু দিতে শিখল। বাবুর্চিরা তাকে ভারি পছন্দ করে, কারণ ঠিক যেভাবে দরকার সেইভাবে সে আলুর খোসা ছাড়ায়। এবং সেই পাথরের-চোখ মানুষটি সব সময় তার দিকে তাকিয়ে দয়ালু হাসি হাসেন, তার কারণ এই আলেনকা তার ওই ক-দেরকে ছাড়া আর কিছুই জানে না, কিছুই দেখে না। বহু দিন হয়ে গেল, আত্মীয়স্বজনকে নিয়ে তার যে জীবন ছিল তার কথা সে ভুলে গেছে।

এতিম ছেলেমেয়েরা গান গায়, খেলা করে। খেলার আগে বা কোনো বড় কাজ করার আগে তারা সমস্বরে গায়ঃ "চলো চলো, এগিয়ে চলো, হও আগুয়ান। মাতৃভূমির ডাকে, টিটোর ডাকে হও সবে এক-দেহ এক-প্রাণ।" এবং সত্যি, সাধারণভাবে, তাদের একজনকে আর একজনের সঙ্গে এতই একরকম দেখায় যে তাদের যে যার যার আলাদা আলাদা নাম রয়েছে সে কথা মনেই পড়ে না।

প্রত্যেক বছর আলেনকা পুরস্কার পায়। সামান্য সেই সব বস্তু। টুথব্রাশ, ব্যাগ, না হয় বই। এক-এক বিষয়ে এক-এক পুরস্কার। উচ্চ নম্বর আর পরিশ্রমের জন্যে এই সব জিনিস সে পায়।

যেভাবে চললে ওই সব পাথরের চোখওয়ালা লোকদের খুশি করা যায় সেইভাবে চলা অবশ্য কিছু দূর পর্যন্ত সহজ। কিন্তু একদিন কী হয়েছে, আলেনকার বয়েস তখন চোদ্দ, ঘটনাক্রমে সে গিয়ে ১৪ নম্বর কক্ষের দরজা খুলে ফেলেছিল, সে দেখে ফেলল, ভেরোচকাকে য়োভান চুমু খাচ্ছে। সে তার জীবনে কখনো এ জিনিস দেখে নি এবং তার ধারণাই ছিল না ১৪ নম্বর কক্ষ এই রকমের গোপন কাণ্ড লুকিয়ে রেখেছে। কেন যে এমন হচ্ছে সে বুঝতে পারে না, কিন্তু তার গাল লাল হয়ে উঠল, সে পালিয়ে এল। তার লজ্জা বোধ হলো। কী? ওটা কী? সে জানে না। এই আশ্রমেও তাহলে এই ধরনের কর্ম হয়?

ছেলেদের সম্পর্কে এ-যাবৎ আলেনকার মতামত ছিল সহজ, পরিষ্কার। ওরা পাখির বাসা চুরি করতে ওস্তাদ, ওরা মার্বেল আর চাকা খেলে খুব ভালো, আর চেরি চুরি করার হেকমত জানে খুবই ভালো। কিন্তু তার মধ্যে হঠাৎ এ আবার কী? তখন আলেনকার বিস্ময়ের অবসান হতে দেরি হলো না। তার কানে ফিশ ফিশ করে এই মর্মে সংবাদ এসে পৌঁছাল যে ১৪ নম্বর কক্ষে য়োভান সব সময় ভেরোচকাকে চুমু খায়। আর মিলান রুডিচাকে চুমু খায়। ১৪ নম্বর কক্ষটি সবচেয়ে উপরের তলায়, সুন্দর গোপনতা রয়েছে। অপরাধ যারা করে তাদের প্রায়শ্চিত্তের জন্যে ওই ঘরটি। ওই ঘরেই পেচিচ তার ছবি আঁকায় ছ পাওয়ার জন্যে বেত খেয়েছিল। ওই কক্ষের নিয়মিত অন্যান্য সব আগন্তুক হচ্ছে গিয়ে এই যারা ডাল ভেঙেছে, ফল চুরি করেছে, বা ঘরের অন্ধি-সন্ধি ঝাড়ু দেয় নি। মোট কথা, এ হচ্ছে যত রকমের পাপের ঘর।

এই প্রথম আলেনকা ১৪ নম্বর কক্ষের দিকে আগ্রহ আর উত্তেজনা নিয়ে তাকাল। ওখানে গেলে তুমি বেত খেতে পার, কিন্তু তুমি চুমুও পেতে পার। ওটা রহস্যের ঘর হয়ে উঠল।

আশ্রমে আসার পর এই প্রথম আলেনকা তার ঘর পরিষ্কার করতে ভুলে গেল। তার মাথার মধ্যে ঘুরছিল ওই ১৪ নম্বর কক্ষ। এবং

তখন সেখানে গিয়ে বেত খাওয়ার পুরস্কার সে পেল। তখন সে ওই কক্ষকে ভেতর থেকেও জানতে পারল। কেমন করে হলো সেটা বড় কথা নয়, কিন্তু ওই কক্ষ তার কাছে ধরা দিল।

একদিন আলেনকা চুমু পেল। সে ঠিক বুঝতে পারল না কেমন করে ওই কাণ্ড ঘটে গেল। কিন্তু ১৪ নম্বর কক্ষে তা ঘটল। আশ্রমে আসার পর এই তার প্রথম চুম্বন। অতঃপর জীবন তার কাছে খুবই মিষ্টি মনে হলো। নিয়ম ভঙ্গ করতে যে ভয় তা আর রইল না। সেই এতটুকু ভালো মেয়ে আলেনকা এমন কিছুর প্রেমে পড়ে গেল যা তার সেই ক-দের থেকে এবং ভালো ভালো যত দৃষ্টান্ত স্থাপন করার ভালোমানুষির থেকে আলাদা। সেই ছেলেটির নাম মার্কো। তবে কেবল মার্কো নয়, য়োভান এবং মিলান এবং আরো কত ছেলে যারা তার সঙ্গে পপলার গাছগুলির সেই আড়ালে বাস করছে তাদের নাম করতে হয়।

এ আলেনকা আর সে আলেনকা নয়। তার চোখে এখন বাসনা, তার কোমল ঠোঁট দুটিতে হাসি।

তার হৃদয়ে সেই ১৪ নম্বর কক্ষের এখনো একটি স্থায়ী আসন রয়েছে।

মিলাদিন চুলাফিচ

আপেল

ওখানে, ওইসব পাহাড়ের একটাতে আপেলগাছটা হয়েছিল, ওখানে আমরা ছেলেবেলায় যেতাম। গাছটা ছিল অদ্ভুত। আর যে জায়গায় ওটা হয়েছিল সেটাও কম বিচিত্র নয়। হয়েছিল মিষ্টি আপেলগাছ, তিক্ত আপেলগাছ। ভাবি, আমরা ওর কোন্ জিনিসটা ভুলতে পারি না? ওর মিষ্টত্ব? না ওর তিক্ততা? আর ওর কাছে আমরা কী কতদূর শিখেছি? আমরা এ-যাবৎ যা কিছু শিখেছি ওই গাছের কাছেই শিখেছি। ওই গাছ আমাদের অ আ ক খ। প্রকৃতির জ্ঞান, আমাদের নিজেদের প্রকৃতির জ্ঞান ওই গাছ আমাদের দিয়েছে।

পাহাড়ের এই রকম ঢালে ওটা কেমন করে ওই রকম লম্বা আর সোজা হয়ে উঠল? ওর চারদিকে বুনো ঢালু মাটি, এখানে ওখানে ছোট ছোট আগাছা। বসন্তে ওই গাছ তার ফুল আর মৌমাছিদের নিয়ে ঝিকমিক করে ওঠে, তার অঙ্গের যত সম্পদ নগ্ন বিকশিত হয়ে ওঠে। তারপর সূর্য যখন আরও উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে, শুকিয়ে ম্লান হয়ে যায়। পাহাড়ের গোটা মাথাই তখন ওই রকম হয়ে যায়। এই পাহাড়ে জলদি জলদি বরফ গলে, পাহাড় তখন মুকুলিত হয়। যা কিছু আছে সব মুকুলিত হয়ে ওঠে। এমনকি পাথরও মুকুলিত হয়। রোদে আর হিমে ভিজে নিপুণ ভাস্বরতায় প্রস্ফুটিত হয়। সব কিছু নীল হয়ে ওঠে, ভায়োলেটের গন্ধে চারদিক মাতাল হয়ে ওঠে। প্রিমরোজ সব কিছুকে চকচকে ঝকঝকে করে দেয়। বুনো চেরির বাঁকা দীঘল শিখায় সবকিছু জ্বলে ওঠে। আর লালের ছোপ-দেয়া সাদা ফুলগুলি তো সর্বত্র রয়েছেই। তখন সাদা পাপড়ির লালিম আভা ফলের কথা বলে। যা কখনো ফোটে না, ওই বুনো মত্ততার উৎসব-মালঞ্চে তাও প্রস্ফুটিত হয়। বন্য নিস্তেজ নিষ্প্রভকে ফোটায়, নিস্তেজ নিষ্প্রভ ফোটায় বন্যকে। এ যেন মহা বন্য অশান্ত বিভ্রম। এখানে বসন্তে কী যে ঘটে পাখিদের গানেও তার ব্যাখ্যা মেলে না।

তখন গরম পড়ে। পাহাড়ের পাথুরে ঢালে সবুজের আর লেশমাত্র থাকে না। পাতা বিবর্ণ হয়, ঝরে যায়, ঘাস মরে যায়। শুধু পাষাণ

জেগে ওঠে। যা কিছু জীবন্ত মরে যায়, যা মৃত, বন্য আনন্দে মাথা তোলে, তার আভ্যন্তর প্রকৃতিকে ওইভাবে উদঘাটন করে। কেবল বুনো চেরির ডালে অল্প কিছু রক্তরাঙা ক্ষুদি-ক্ষুদি ফল অগ্নিশিখার মতো জ্বলে।

তবে ওই আপেলগাছও ফল দেয়, প্রত্যেক বছর, অজস্রভাবে দেয়। ওই গাছকে নিয়ে আমাদের বড় গর্ব। আমরা বাবার কাছে শুনেছি, একদা বহু কাল আগে কোন্ বহু দূর থেকে একটা লোক এসেছিল, সে এসে প্রস্তাব দেয় কতকগুলি গাছের কলম করে দেবে। এই এলাকায় সে কতকগুলি আপেলগাছের কলম করে দেয়, আমাদেরও করে দেয়, দিয়ে কোথায় চলে যায়। গাছের যে ডালই তার হাতের ছোঁয়া পেয়েছে, বড় হয়েছে, ফল দিয়েছে। বাবা বলতেন, সেই ব্যক্তি সামান্য লোক ছিল না।

আমাদের নজর থাকত সব সময় ওই গাছটির উপর। বরফের একটি গালিচা গলে যাবে, গরম মাটি ভেদ করে আর এক গালিচা মাথা তুলবে, সেটাও মিলিয়ে যাবে। আর তখন আপেল বেশি দূরে নয়। প্রথমে ক্ষুদি-ক্ষুদি ঝাপসা তন্দ্রালু যেন কিছু দেখা যায়, এগুলি ফলও নয়, ফুলও নয়। তখন ডালগুলি ঝক্-ঝক্ করে ওঠে, পত্র-পল্লব ফুটে বেরোয়। যেমন যেমন আপেল বড় হয়, আমাদের চোখগুলিও বড়-বড় হয়ে ওঠে।

শেষে তারা পাকতে শুরু করে। সবুজ ক্রমে হলুদ হয়ে তারপর সাদাটে রং ধারণ করে। খোসা পাতলা হয়, বিচি কালো হয়। তার ভেতরে যে সূর্য থাকে সে তাকে জ্বালিয়ে দেয় এবং তাতেই সে মিষ্টি হয়ে ওঠে। (আপেল রোদ খায় আপেলের মতো, ওতেই সে বাড়ে আর পাকে।)

আমরা তখন ওখানে যাই, আমরা দু'জন, আমার অগ্রজ আর আমি, আপেলের দিকে তাকিয়ে থাকি, বড়-বড় চোখ করে।

তখন আমাদের ওই এক কাজ। দুপুরের দিকে, চুপি-চুপি কাজ ফাঁকি দিয়ে আমরা ওইখানে গিয়ে দাঁড়াব, মাথা তুলো হাঁ করে তাকিয়ে থাকব।

ততদিনে পাহাড়ের পিঠ সম্পূর্ণ শুকিয়ে গেছে। একটি ঘাসও কোথাও নেই। দুপুরের রোদে তেতে ওঠা ধারালো সব নুড়ি আমাদের পায়ের তলায় কামড় দেয়। বুনো চেরির হাড্‌ডিসার ডালে অবশিষ্ট আছে শুধু গ্রন্থিগুলি. তাতে গড়িয়ে পড়ে ফলের সবুজ রসানি। পাহাড়ের এই শুকনো পাষাণে ওই চেরির যে এত কষ্ট, কিন্তু তারপর ওর থাকবে কী? থাকবে কেবল বিচিগুলি। মধ্য-গগনে জ্বলছে সূর্য, এখানে জ্বলছে ক্রুদ্ধ রৌদ্র-শিখা। ওই লেলিহান শিখা পাহাড়, প্রকৃতি আর সমগ্র বিশ্বটাকে লেহন করছে। কাছেই কোথায় ঝিঁ-ঝি ডাকছে, ও যেন পাষাণেরই ডাক, শুষ্ক পৃথিবীর ডাক, তৃষ্ণার ডাক। পাহাড় জুড়ে ঝিঁ-ঝি পোকা ডেকেই চলেছে, ডেকেই চলেছে, যেন হাহাকার ছড়িয়ে দিচ্ছে, আমরা পিয়াসী, আমরা পিয়াসী।

বিমূঢ় আর মূক, আমরা আপেলগুলির দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকি। যেগুলি আগে এসেছিল, নিশ্চয় পেকে থাকবে। ওতে প্রতি দিন নতুন রূপান্তর আর নতুন বিস্ময়। এবং তখন মুহূর্তের জন্যে ভুলে যাই আমরা এসে এখানে কেন, কী করব বলে দাঁড়িয়ে আছি।

আচ্ছা, কেমন করে এই গাছে এখানে এই রকম ফল ধরল? এই রকম আপেল ও কোত্থেকে পেল? কোন্ গভীর থেকে, কোন্ দূর অজানা পথে কোন্ ফোয়ারা থেকে ওর মধ্যে ওই মধুর ধারা প্রবাহিত হয়েছে? নাকি ওই জিনিস ও আসলে শোষণ করেছে পাহাড়ের ওই মাটি থেকে? সারা পাহাড়ে একটি গাছ কি একটি লতা এখন নেই যাতে একটি পাতা রয়েছে। তাহলে কি বসন্ত তার গর্বের ধন যা-কিছু এনে পাহাড়কে দিয়েছিল তারই সঞ্চিত মধু এখন পাহাড় তার সকল শূন্য করে এই গাছের ফলগুলিতে সিঞ্চন করছে? এই আপেলগাছে সে তার সকল প্রসাদ ঢেলে দেবে বলেই কি আর যা কিছু ছিল তার জন্যে ওই শাস্তির বিধান হয়েছিল?

আর এই যে আমরা, আমাদের কী খবর? এই আপেল, এ আমাদের কী? এ কি তিরস্কার? না পুরস্কার?

পাহাড়ের ঢাল একেবারে ঢালু হয়ে নিচে নেমে গেছে, কোথাও ঠেকা বা বাধা কিছু নেই। এমনকি আমাদের বাড়িরও একটা দিক,

বাড়ির বেড়া ঢাল্ হয়ে নেমে গেছে। আপেল পড়লে যাতে গড়িয়ে পালিয়ে যেতে পারে তার জন্যেই যেন এই ব্যবস্থা করে রেখেছে প্রকৃতি। পাকা আপেল গাছ ছেকে পড়লেই হয় ছিট্‌কে গড়িয়ে লাফাতে লাফাতে চলে যায়, নয় ছিঁড়ে খুঁড়ে থেঁতলে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়, নয় তো নিচে গিয়ে জঙ্গলের গভীরে হারিয়ে যায়।

সব সময় এই রকমটি হয়।

প্রত্যেক বছর বাবা বলবেন. একটা বেড়া করে দেব। কিন্তু ওই পর্যন্ত, করা আর হয় না। সব সময় ওই বেড়ার চেয়ে জরুরি অন্য কোনো কাজ পড়ে যায়, এমন কাজ যা না করলে কিছুতেই চলবে না, কিংবা এমন কাজ যা তিনি ছাড়া আর কেউ করতে পারবে না। কিন্তু, আবার এদিকে এই আপেলগাছকে নিয়ে তাঁর খুব গর্ব। তিনি বলেন, আমি আমার জীবনে ওই রকম আপেল মাত্র একবার দেখেছি, যুদ্ধের সময়, ওহ্, যদি তার একটাও আমি কোনো রকমে পেতাম, কিন্তু আমরা যে তখন পালাচ্ছি, ওই আপেল মাটিতে কত পড়ে রয়েছে, আর ওরা গুলী ছুঁড়তে ছুঁড়তে ধাওয়া করে আসছে, আমি অবশ্য পালাতে পালাতেই আপেল একটা কুড়োতে পারতাম, কিন্তু মানুষের গায়ে এসে গুলী লাগছে, সম্ভবত সেই ওরাও আমাদের মতোই ক্ষুধার্ত ছিল, কিন্তু ওরা আপেলের দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না, ওরাও ছুটছে আমরাও ছুটছি, আমাদেরকে যে ওদের ধরতে হবে, ওহ্, সে কী দৌড়ানো, সে কী তাড়া খাওয়া। বুঝলে, এই রকমের আপেলগাছ দেখা যায় না, বুঝলে, বাবারা। আগামী গ্রীষ্মে একটা বেড়া তুলে দেব, ঠিক! দেখো। আমার হাতে, মানে, এখন ঠিক সময় নাই। একদম উঁচু বেড়া তুলব, বুঝলে কত। লাফাবে। একটা আপেলও টপ্‌কে বেরিয়ে যেতে পারবে না দেখে নিয়ো।

আমাদের প্রতিবেশীরা এই আপেলকে নিয়ে রসিকতা করত। বলত, ওরা আপেল খাওয়ায় কাকে? জঙ্গলকে। আহা রে, আমাদের যদি ওই রকম একটা আপেলগাছ থাকত।

তপ্ত পাথরে হল্‌দেটে রসের একটু দাগ। সঙ্গে সঙ্গে পাথর সেটুকু শুষে নেয়। মনে হয়, যেন পাথর একটা গোটা আপেলই এইমাত্র গিলে নিল।

আমরা একটা একটা করে পাথর তুলি। ওইগুলি যাচ্ছে তাই গরম বলে হাত পুড়ে যায়। গুঁড়ির উপর দিকে পাথরগুলো জমা করি। ওইগুলোতে উঠলে আর আমি ঠেলা লাগালে আমার ভাই সবচেয়ে নিচের ডালটা ধরতে পারে। তখন সে উঠে মহানন্দে ডালে-ডালে লাফিয়ে বেড়ায়। কিন্তু ওই আনন্দ বেশিক্ষণ নয়। হাতের কাছে রয়েছে কয়েকটি আপেল, কিন্তু কাঁচা। বড় বড় পাকাগুলোকে কেমন করে ধরা যায়। রোদে ওগুলো জ্বল্-জ্বল্ করছে। আমার ভাই তার অকর্মা হাতদুটির দিকে তাকায়, তার হাত আর চোখ একে অপরের দিকে তাকায়। কাণ্ডখানা এই রকম যে কেন হয়ে আছে ?

সে বলে, এখন আমি ডাল নাড়া দিচ্ছি। তুমি ওইখানে গিয়ে দাঁড়াও, প্রস্তুত হয়ে থাকো।

আস্তে আস্তে সে ডাল দোলাতে থাকে, ওপর থেকে নিচে সরল সোজা টানছে, যেন মরীয়া এক প্রার্থনা নিবেদন করছে। আমি উদগ্রীব উত্তেজিতভাবে অপেক্ষা করে আছি। আমার হাত, আমার চোখ, আমার মুখ, আমার শরীরের প্রতি কোষ প্রস্তুত হয়ে আছে। আমি হাঁ করে রয়েছি, যত আপেল আর আকাশ, ওদের যেন গিলছি। আমার হৃৎপিণ্ড নড়ন্ত আপেলের শব্দের সঙ্গে স্পন্দিত হচ্ছে। এখনো একটাও পড়ে নি, কেবল আমার এই বুকেরটি ছাড়া। আমার ভাই আর একবার সাবধানে ডাল নাড়া দিল। পড়ল না। প্রত্যাশায় উত্তেজনায় আমি ইতিমধ্যে আমার সমস্ত দম, সমস্ত শক্তি শেষ করে ফেলেছি। আমার ভাই আরো জোরে নাড়া দিল। আপেলের তবু পড়ার ইচ্ছা নেই। তখন হঠাৎ, হ্যাঁ, দ্রুত ওই যে ঢাল বেয়ে গড়িয়ে আসছে। আমি উন্মত্তের মতো হাত চালাতে লাগলাম, একটাকেও পালাতে দেব না। কিন্তু না, একটাকেও ধরতে পারলাম না। ওরা পালিয়ে যাচ্ছে, গড়িয়ে গড়িয়ে ছুটছে, হ্যাঁ, অবজ্ঞায় নাক সিঁটকাচ্ছে, (যেন হেসে কুটি-কুটি) ভেঙে ছত্রখান হয়ে যাচ্ছে, আমি ওদের পালিয়ে যাওয়া দেখছি, আমার হাত সামনে দুলছে, যেন এই তো একটা ধরে ফেলেছি, যেন ধরতে গিয়ে ব্যথা। একটা ছোট শুকনো ফাটা আপেল ধরে ফেলা গেল। ও আমাদের মুখের উপর

নিষ্করুণ করুণা, বিদ্রূপ করছে। ওটাকে তুলে পালায়নপর অন্যগুলির দিকে তাক করে ছুড়ে মারলাম, যা, তুইও যা, ওদের সঙ্গে যা।

আমরা তখন একসঙ্গে বলে উঠি, ভালোগুলো সব গেছে।

তখন আমরা একে অন্যকে দোষ দিতে লেগে যাই। আমি অন্তত একটাও তো ধরতে পারতাম? আর অত জোরে কেন সে নাড়া দিল ডালে? সে বলে, আমি যদি আপেল কুড়োতে নিচে থাকতাম, দেখতে। আমি বলি, আমি যদি গাছে উঠে ডালে ঝাঁকি দিতাম, দেখতে।

আমরা তখন কাজ বদল করি! সে নিচে দাঁড়ায়। প্রত্যেকটা আপেল সে ঠেকাবে, হাত দিয়ে, চোখ দিয়ে, দরকার হলে দাঁত দিয়ে ঠেকাবে। ওই যে ওগুলোকে দেখা যাচ্ছে, ডালে ঝুলছে। আমার তো একদিকে উদ্বেগ, আর দিকে আনন্দ। একটা ডালে ঝাঁকি দিই। আপেল পড়ে, পড়ে অমনি বিদ্যুতের বেগে ঢাল বেয়ে অন্তর্ধান করে। আমার ভাই ঘুরপাক খায় আর চারদিক হাঁতড়ায়। হাত দুটোকে এখন সে কোথায় লুকোবে তাই ভাবে।

সব চলে গেছে। আমাদের গলার সেই শব্দকে মনে হয় এতক্ষণ যা কিছু ঘটল তার শেষ প্রতিধ্বনি।

তুমি অন্তত একটাও তো ধরতে পারতে?

একটা? একটা ধরতে পারলে আর কী হতো? আর বলি, তুমিও একটু আস্তে নাড়া দিতে পারতে।

আর ওদিকে ঠিক তখন কোনো গুরুজন হাঁক পাড়তে শুরু করেছেন। তিরস্কার অভিসম্পাত সবই একসঙ্গে চলছে। সারাদিন সব কোথায় কোথায় কী তোদের চলছে, ওরে ও-ই? ঘরে কাজকর্ম নাই? ইত্যাদি।

তখন আমরা আর করতে কী পারি? আশা নিয়ে ঘরে ফিরতে পারি যে পরের বার আর একটু সতর্কভাবে ওই কাজ করব।

কিন্তু পরের দিনও সেই একই ব্যাপার ঘটে। আপেল পড়ে, অধিক থেকে অধিক পড়ে, কিন্তু একটাও ধরা যায় না। আমি বুদ্ধি দিই, এসো, দু'জনেই আমরা গাছতলায় দাঁড়াই। দু'জনে দাঁড়িয়ে থাকি, রুদ্ধশ্বাসে আশা নিয়ে অপেক্ষা করি, কিন্তু আপেল একটাও পড়ে না। কিন্তু যেই একটু অন্য দিকে তাকিয়েছি, একটা পড়ে। সে বলে, আমি

হলে দেখতে। আমি বলি, আরে, বলো কী? আপেলটা তো তোমার গায়ের উপর পড়ল, আমার গায়ে তো পড়ে নি। সে বলে, ওহ্, কী যে ঢাল। এই যে, সাবধান! শেষে তুমিই না গড়িয়ে নিচে চলে যাও।

আচ্ছা, এই আপেলগাছটা আর কোথাও না হয়ে ঠিক এখানটায় হয়েছিল কেন? কার জন্যে হয়েছিল? কার জন্যে ওতে ওই সব ফল ধরে? কেন ধরে? পড়ে গড়িয়ে কোথায় মিলিয়ে যায়? কার কাছে যায়? ওই আপেল? কেবল নষ্ট আর ভ্রষ্ট হওয়ার জন্যে ওগুলো হয়? কেবল পাগলামি করার জন্যে হয়? আমাদের গলায় যত তিক্ততা ঢেলে দেয়ার জন্যে হয়?

কখনো সখনো এক-আধটা আপেল হয়তো আমাদের হাতে এসে লাগে। কিন্তু সেও সব সময় তিক্ত অপমান। আমাদের পাশ দিয়ে গড়াবার সময় হয়তো সেটা পাথরে আঘাত খেয়েছে, ছিট্‌কে যাওয়ার সময় অমনি আমাদের ঠোঁটে এককোঁটা দু'ফোঁটা রস ছড়িয়ে গেল। কিংবা হয়তো আপেলটি একটা কাঁটাগাছে গিয়ে আটকে গেল।

ভালোগুলিকে তো কখনোই ধরতে পারা যায় না।

আরো কতকগুলো বিরূপ ব্যাপার অবশ্য এর সঙ্গে রয়েছে। যেমন রয়েছে অমনোযোগ, অতি-মনোযোগ, হয়তো ধরতে গিয়ে ভেঙে নষ্ট হয়ে যাবে এই ভয়, কিংবা ধরার জন্যে অতিরিক্ত ব্যস্ত-সমস্ত লম্ফ-ঝম্প।

কখনো কখনো আমরা নিচে জঙ্গলে গিয়ে নামি, নেমে আপেলের খোঁজ করি, কিন্তু কখনো একটা আপেল পাই না। দু-একটা যা পাই ভাঙা, নষ্ট, খাওয়া, পচা।

শেষ পর্যন্ত এখানে এই পাহাড়ে আমাদের উপলব্ধি এই হলো যে আমাদের অস্ত্র হচ্ছে অপর্যাপ্ত, আর আপেলগুলি চতুর। এবং আমাদের অন্তরাত্মা···থাকগে, অন্তরাত্মার কথা কে জানে, সেই রহস্যের অভ্যন্তরে কে প্রবেশ করতে পারে।

ঠিক আছে, পরে দেখা যাবে। পরে অন্য সময়ে অন্যভাবে আমরা চেষ্টা করে দেখব, অন্য কোনো দিন, অন্য কোনো বৎসর।

আর এইভাবেই চলতে থাকল, দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর।

এবং সেই ঘটনা এখনো হামেশা ঘটে চলেছে। ওই পাহাড়ে সেই সময় যে শিক্ষা আমাদের হয়েছিল, যে পাঠ আমরা গ্রহণ করেছিলাম, কেউ না কেউ এখনো তা গ্রহণ করতে যায়। সর্বদা সেই একই কাণ্ড ঘটে। আপেল বিদ্যুতের বেগে দ্রুত ঝলকানি তুলে পাশ দিয়ে গড়িয়ে চলে যায়। মনোহর, তিক্ত-মধুর, পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে, চলে গেল, হারিয়ে গেল।

মিলান আন্দ্রিচ

পেন্তা

পেন্তা কাঠের তেপায়ায় বসে ছিল, উঠল, পর্বত-গুহায় ঝর্না যে রকম লাফিয়ে ওঠে সেই রকম করে উঠল। পাইপে আরো দুটো টান লাগাল, তারপর এক-কোনায় সেটা ছুঁড়ে ফেলে দিল। তখন তাকে ঠিক মায়ের দুধ ছাড়িয়ে দেয়া শিশুর মতো বিষন্ন আর বিব্রত দেখাতে লাগল।

বউকে বলল, এই শেষ।

বউ কিছু একটা বলতে হয় তাই বলল, পেন্তা ডিয়ার, বলো আমরা কী করতে পারি?

তার ইচ্ছা করে স্বামীকে সাহায্য করে। কিন্তু কেমন করে করবে তার কিছুই ভেবে পায় না। তার কোলে গিয়ে বসতে পারে, বসে' মানব-লতার মতো দুই বাহু দিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরতে পারে, এবং তার বিপুল উষ্ণ বুক তার বিপর্যস্ত মাথার উপর চেপে ধরতে পারে, তার দুই উরু দিয়ে তাকে জাগিয়ে তুলতে পারে, তুলে অন্য দিকে তার চিন্তার মোড় ঘোরাতে পারে। কিন্তু তার ভয় করে। এই তো কেবল সকাল হয়েছে। সে জানে, এমন সময়ে স্বামীর গায়ে গা রাখার কী মানে। সেবার সেই যে মাদী ঘোড়াটা মারা গেল, সে তখন এই-ভাবে তাকে সাহায্য করতে চেয়েছিল, তার ফলে তাদের তৃতীয় শিশু মারিঙ্কো পৃথিবীতে এল। সেই মারিঙ্কোর বয়েস এখন পাঁচ।

দু'মাস হলো পেন্তা বেকার বসে রয়েছে। তার মুখের উপর ওরা কারখানার দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। বলেছে, ও বাড়তি। আর সেই থেকে ও আর শহরের বেকারি থেকে সেই সাদা গোল-গোল গরম পেস্ট্রি আনে না। বাচ্চাদের সঙ্গে সে আর খেলেও না। রাত্রে বউকে আর আদর করে না। গলার আওয়াজ হয়েছে শুকনো, কর্কশ। মুখের হাসি কোথায় চলে গেছে। চোখের খুশি মুছে গেছে।

পেন্তা চুপচাপ বাড়ি থেকে বেরোল। বাচ্চাদের ঘুম ভেঙে যাবে বলে দরজাও বন্ধ করল না। শূন্য গোয়ালের সামনে গাছের গুঁড়ি পড়ে

ছিল, তার যেদিকে রোদ সেখানে বসল। মরা কাঠের গা থেকে এক টুকরো ছাল ছাড়িয়ে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়তে লাগল। খোলা দরজা দিয়ে বউ তাকে দেখছে। রুটির আটা মাখতে মাখতে স্বামীর ভাবনাগুলিকে সে অনুমান করার চেষ্টা করছে। বাচ্চাদের শব্দে চিন্তা বাধা পেল। ওরা বিছানায় খেলছে। আঙুল থেকে মাখা আটা ছাড়াতে ছাড়াতে তাড়াতাড়ি টিন বন্ধ করল। আটা বড় জলদি শেষ হয়ে যাচ্ছে। টিনের প্রায় তলা দেখা যাচ্ছে। এই ব্যাপারটাও আজ সকালে পেন্তাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছে।

ছালের নিচে কাঠে ঘুণ ধরেছে। তাই দেখতে দেখতে তার মাথার ভেতর একটা ছবি ভেসে উঠল: এই গাছের গুঁড়ির গভীর অভ্যন্তরে ঘুণ-পোকার গোটা এক সংসারই রয়েছে। বাপ-পোকা, মা-পোকা, ছেলেমেয়ে-পোকা। আমরণ এদের একমাত্র প্রয়াস এক গাছ থেকে আর এক গাছে যাওয়া, গাছের ছালের নিচে গুটি-গুটি প্রবেশ করা, তারপর খাওয়া, কেবল গেলা।

এখন হঠাৎ সেই মরা মাদী ঘোড়া পা ঠুকে ঠুকে তার চিন্তায় ব্যাঘাত ঘটাল। এবং এই নতুন চিন্তাটাকে তার ভারি মজাদার মনে হলো। ঘোড়া পাথরে খুরের নাল ঠুকলে যেমন স্ফুলিঙ্গ ওঠে, চিন্তাটা সেই রকম তার মাথায় ঝলক মারল। পেন্তা চিন্তাটাকে তার মগজের ভেতর লালন করতে লাগল, সেটা অভাবিতভাবে তাকে গ্রাস করল এবং হৃৎপিণ্ডে গিয়ে আঘাত করল। সে যেমন চাঙ্গা হয়ে উঠল, তেমনি অন্য দিকে তার মনের মধ্যে কেমন যেন করতে লাগল। হয়তো তার মাদী ঘোড়ার আত্মা সেই অন্য দুনিয়া থেকে তার কাছে কদম চালে ফিরে এসেছে, তার এই দুর্দিনে তাকে সাহায্য করতে চায়। পেন্তা হাসতে লাগল। কিন্তু তখনি আবার গম্ভীর হয়ে গেল। না, এ পাগলের পাগলামি নয়।

সে মনে মনে বলল, 'উপোসের চেয়ে মুখোশ ভালো'।

এবং তখন তার সেই ১১৩ নম্বর কক্ষের কথা মনে পড়ে গেল, যেখানে ওরা তাকে বলেছিল, আমাদের বড় খারাপ সময় যাচ্ছে ভাই রে, আমাদের উৎপাদনের ক্ষমতা বাড়াতে হবে। তারপর ৩১৩ নম্বর কক্ষের

কথা মনে পড়ল, যেখানে শুনেছিল, বরখাস্ত, হুম্। শুনেছিল, তোমার বউ-বাচ্চা আছে, হুম্। বড় নিষ্ঠুর কাজ হলো, কমরেড পেন্তা, আমি সহানুভূতি জানাই, কিন্তু আমার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ, হুম্।

তারপর ৪১৩ নম্বর কক্ষ। সেখানে শোনা গেল, অসুবিধায় পড়লে তোমরা সবাই এখানে চলো এসো। পেন্তা, বছরের পর বছর তোমার এক-পা ছিল গ্রামে, এক-পা এই শহরে, এক-পায়ে পরেছ গাঁয়ের চটি, অন্য পায়ে শহরের বুট। কোথায় যে তোমার জন্যে কী করি কিছুই ভেবে পাই না।

পেন্তা খিক্ খিক্ করে হাসল। সেই হাসির শব্দ তার বাড়ির ভেতরে গিয়ে পৌঁছাল, বউয়ের কানে গিয়ে ঢুকল। বউ উঠানে ছুটে এল, কিন্তু দেখল স্বামী গোয়ালের ভেতর মিলিয়ে যাচ্ছে। গোয়ালের ভেতর গিয়ে সে ঘোড়ার ডাক ডাকতে লেগেছে। যেন কাউকে ডাকছে। বউ ভাবল সেই মাদী ঘোড়াটাকে ডাকছে। কী সে করছে দেখার জন্যে বউ গোয়ালের জানালায় ছুটে গেল। পেন্তা ঘোড়ার জিন পরেছে, মুখে লাগাম নিয়ে লাগামের লোহা চিবোচ্ছে। নিজের গলার দড়ি একটা খুঁটিতে বেঁধে হাঁটু গেড়ে চার পায়ে দাঁড়িয়েছে এবং ভয়-খাওয়া ঘোড়ার মতো পা ছুঁড়ছে। বউ বলল, লোকটার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

আতঙ্কে বউ দৌড়ে পালিয়ে গেল। বলল, আমার কপালে এই ছিল!

পেন্তা ধুলো-মাখা জিন নিয়ে গোয়াল থেকে বেরিয়ে এল। তার মুখে একটি বাঁকা হাসি লেগে রয়েছে। চোখ-দুটি হয়ে আছে ঘোড়ার চোখের মতো, গভীর আর চঞ্চল।

বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে বউ বলল, এ কী হচ্ছে, পেন্তা ডিয়ার?

সে বলল, কেন, দেখছ না, সেই মাদী ঘোড়াটার জিন?

বলে' অমনি ঘোড়ার ডাক ডাকল।

পেন্তা ছোট ছেলেটাকে ডাকল, মারিঙ্কো!

ছেলেটা ছুটে গিয়ে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। পেন্তা বলল, খেলবি? আমার সঙ্গে?

ছেলে সোৎসাহে বলল, হ্যাঁ, খেলব। কী মজা! বাবা, আমরা কী খেলা খেলব?

ছেলে আনন্দে চক্কর মেরে লাফাতে লাগল।

পেন্তা বলল, আমি হব ঘোড়া। গোয়াল থেকে চাবুকটা নিয়ে আয়, যা।

ছেলেটা দৌড় লাগাল, চাবুক নিয়ে ফিরে এল, সাঁই সাঁই করে হাঁকাচ্ছে চাবুক। বউ দৌড়ে বাড়ির ভেতর পালিয়ে গেল, দরজার আড়ালে লুকিয়ে কাঁদতে লাগল। পিঠে জিন বেঁধে পেন্তা দেখতে দেখতে চার হাত-পা গেড়ে ঘোড়া সেজেছে, গাছের গুঁড়ির চারপাশে সে খুর ঠুকে-ঠুকে ঘুরছে আর হ্রেষা-ধ্বনি করছে। তার পিঠে বসে ছেলে আনন্দে চিৎকার করছে, চাবুক আছড়াচ্ছে। পেন্তার দাঁতের ফাঁকে লাগামের লোহা কিড়মিড় করে শব্দ তুলেছে।

তারপর একসময় সে থামাল। চেঁচিয়ে বলল, এই গর্দভ, নাম্!

মারিঙ্কো লাফ মেরে নেমে দাঁড়াল। বাবা জিজ্ঞেস করল, কী রে, ভালো লাগল?

ছেলে বলল, ওহ্, ঘোড়ায় চড়লে যেমন লাগে ঠিক তেমনি। আরো চড়ি, বাবা?

নিজের পাছায় থাবড়া মারতে মারতে বাবা বলল, আবার কাল সকালে। আজ আর নয় রে, বাবা।

এবং বউকে বিরাট দুশ্চিন্তায় ফেলে পেন্তা পিঠে জিন বেঁধে হাতে চাবুক ঝুলিয়ে পাহাড়ের দিকে যাত্রা করল। সে নিজেই ঘোড়া, নিজেই ঘোড়ার সহিস। দুপুর নাগাদ সে রাভ্নায় গিয়ে পৌঁছাল। মাটিতে কম্বল বিছিয়ে পর্যটকরা সব পড়ে রয়েছেন। গা সেঁকার জন্যে সব সূর্যের দিকে মুখ করে রয়েছেন। বাচ্চারা সব লাফা-লাফি করে বেড়াচ্ছে, তন্দ্রালু মা-বাবাদের বিরক্ত করছে। পেন্তা গিয়ে তাদের মাঝখানে হাঁটু গেড়ে হাত দুমড়ে ঘোরাঘুরি করতে লাগল। তার ফলে হাসির রোল উঠল। সমস্ত খোলা জায়গাটি যেন তাতে বেজে উঠল। সে ঘোড়ার ডাক ডেকে চলল, পা ঠুকতে লাগল, ঠুকে ঠুকে মাটিতে দাগ করে ফেলল, আর কান খাড়া করে চুল-ভর্তি মাথা দোলাতে লাগল।

বাচ্চারা সব চিৎকার করে বলতে লাগল, ঠিক যেন সত্যি ঘোড়া! কী মজা!

চলতে চলতে তখন সে এক বৃহৎ বুনো নাশপাতি-গাছের কাছে গিয়ে পৌঁছাল। গাছটির গুঁড়িতে বিপুল এক ব্যক্তি হেলান দিয়ে বসে রয়েছেন। তাঁর স্ত্রী পাশে ঘাসে নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন, চঞ্চল এক পুড্‌ল্, ক্ষুদ্র লোমশ কুকুর, তাঁর পায়ের সঙ্গে সোনার শিকল দিয়ে বাঁধা, সে তাঁর হাঁটু চাঁটছে, তাতে তাঁর গালে আর ঠোঁটের কোণে বিচিত্র তুষ্টি কেঁপে-কেঁপে উঠছে। বাচ্চাগুলি তেকোনা করে বাঁধা বাবার লম্বা টাই ধরে টানাটানি করছে। বাবা গলায় গর্-গর্ শব্দ করছেন কিন্তু তাঁর আরামের অবস্থাটি থেকে নড়ছেন না। থক্‌থকে মাংসের মাঝখানে তাঁর চোখ-দুটি গভীর আরামে মগ্ন। কিন্তু চোখের পাতা পিট্‌পিটিয়ে তাঁকে মাঝে-মাঝে বাচ্চাগুলির উপদ্রব তাড়াতে হচ্ছে, যেন ওগুলি মাছি। পেন্তা নিশ্চল দাঁড়িয়ে তাঁকে দেখছে। তখন সে আবার হামাগুড়ি দিল। ঘোড়ার জিন পেন্তার ঘাড়ে গিয়ে আঘাত করল।

কমরেড পেন্তা না?

মোটা মানুষটি দ্বিধার সঙ্গে বললেন। তখন ৩১৩ নম্বর কক্ষের সেই আলোচনা তাঁর স্মরণ হলো। আবার বললেন, এই মিয়া, পিঠে তুমি আবার ওটা কী বেঁধেছ?

পেন্তার মুখে হাসি। বলল, কিছু না। জিন লাগাম চাবুক এইগুলি নিয়ে এসেছি, এই আর কী। আপনার বাচ্চাগুলিকে আমি খেলা দেব। ওরা একটু চঞ্চল, তাই না? আপনার আরাম বিশ্রাম হচ্ছে না। আমি দেখছিলাম, ওরা আপনাকে জ্বালাতন করছে।

তারপর সে হাঁটু গেড়ে ঘোড়া সাজল। বাচ্চারা ছুটে গেল। কে আগে, কে আগে?

৩১৩ নম্বর কক্ষের ভদ্রলোক বলে উঠলেন, না না, মনে হয়, এ ঠিক নয়, কমরেড পেন্তা, হুম্। মানে, যতই হোক, তুমি ঘোড়া নও, তুমি মানুষ, হুম্।

পেন্তা বলল, ওই একই কথা হলো। আপনার দেখছি ভারি কুসংস্কার।

৩১৩ নম্বর কক্ষের ভদ্রলোক বললেন, আমি জানতাম তুমি পেন্তা ভারি স্মার্ট লোক। আমি তা ভালো করেই দেখেছি। কিন্তু, আচ্ছা,

এই রকম সহজ কিন্তু চমৎকার বুদ্ধি তোমার কেমন করে হলো বলো দেখি ? বুঝলে, আমার কিন্তু ভয় হয়েছিল তোমার রুজি-রোজগার হবে না। কিন্তু দেখো তো, কী রকম চালাক বিচক্ষণ, কাজের লোক তুমি ?

তিনি তাকে একটি সিগারেট সাধলেন, সে নিল। নিয়ে পেন্তা ঘোড়ার গলায় বলল, তাহলে তো বাচ্চারা আরো মজা পাবে, তাই না ? সিগারেট খাওয়া ঘোড়া !

বিপুল সেই ভদ্রলোকের ভুঁড়ি উচ্চহাস্যে নেচে উঠল। বললেন, তুমি খুব প্রতিভাবান লোক, পেন্তা, সত্যি তুমি একখানা প্রতিভা। তুমি শয়তানের মতো চালাক। এসো, খোকা-খুকুরা, এই যে, তোমরা সব ঘোড়ায় চড়ে নাও। শুধু একটা কথা মনে রেখো, বেশি দাবড়িয়ো না, বাছারা, ঘোড়ার বয়েস একটু পড়তির দিকে।

পেন্তা পকেট থেকে একটা দেয়াশলাইয়ের বাকসো বের করল, ওর মধ্যে সে ডজন-খানেক ঘোড়া-মাছি ধরে এনেছে। একটা বের করে নিজের ঘাড়ে বসিয়ে নিল, তারপর দুই পাছায় দুটি বসাল। ৩১৩ নম্বর কক্ষের ভদ্রলোকের ছেলে টান-টান করে রাশ ধরল এবং পেন্তা তার নতুন কর্মে লেগে গেল। ছেলেমেয়েরা তার চারদিকে ভিড় জমিয়েছে, কান ধরে টানছে, গাছের ডাল-পাতা দিয়ে তার দুই পাঁজরে মারছে। পেন্তা তাতে আগের যে কোনো সময়ের চেয়ে ভালো চিৎকার দিচ্ছে, হ্রেষা তুলছে। এমনকি যাঁরা ঝিমোচ্ছিলেন তাঁদের তন্দ্রা ভাঙিয়ে সে ছাড়ল। ৩১৩ নম্বর কক্ষের ভদ্রলোকের ভুঁড়ি উথাল-পাথাল করে চলল। তাঁর উচ্চহাস্যে তাঁর স্ত্রীর ঘুম ভেঙে গেল।

তাঁর স্ত্রী চোখ ঘষতে ঘষতে জিজ্ঞেস করলেন, এ আবার কী সার্কাস চলছে, অ্যাঁ ?

সারা গা দুলিয়ে হাসতে হাসতে পৃথুল ভদ্রলোক বললেন, বলতে পারো, মানুষ-ঘোড়া। আমাদের প্রাক্তন কর্মচারী পেন্তা, বুঝলে, এই নতুন কাজ উদভাবন করেছে। ওই যে দেখো, কেমন চতুর। খুব হেকমত জানে। এই তোমাকে বলছি, ও কখনো না খেয়ে মরবে না।

সূর্যাস্ত পর্যন্ত পেন্তা মানুষ-ঘোড়ার কাজ চালিয়ে গেল।

৪—

সকল ছেলেমেয়ের তার পিঠে চড়া হয়ে গেছে। কেউ একবার চড়েছে, কেউ দু'বার। সন্ধ্যা হওয়ার সামান্য আগে ততক্ষণে সে সাহস করে প্রতি পাঁচ মিনিটের সোওয়ারির জন্যে পঞ্চাশ দিনার হাঁকতে লেগেছে। ফলে, তা বেশ কিছু অর্থ সে কামিয়ে ফেলল। এ-ছাড়া, বাচ্চাদের মায়েরা তাকে একটি নাইলনের ব্যাগ উপহার দিলেন। তার মধ্যে টিনের মাছ আর কমলা-লেবু। তাতে চকোলেটের দুটি পিণ্ডও রয়েছে। পাহাড় থেকে নামার সময় পেন্তার এক হাতে জিন, অন্য হাতে সারা দিনের তার রোজগার। সে রাত্রে সে মহা তৃপ্ত মনে শুতে গেল এবং গাছের মরা গুঁড়ির মতো ঘুমাল।

মিলিসাভ সাভিচ

কমরেড

স্য়েনিচায় দুর্ভাগ্য তাকে তাড়া করে ফিরল। স্য়েনিচা স্তারি ভ্লাহ্ জেলার একটি গ্রাম। ১৯৪৮ সালে, তারপর আবার ১৯৫২ সালে সে জেলে যায়। তারপর সে এ-কাজ ছেড়ে ও-কাজ, ও-কাজ ছেড়ে সে-কাজ ধরে। তখন তার বউ তাকে ত্যাগ করে অন্য একজনকে বিয়ে করে। তারপর, তার একমাত্র ছেলে, কুড়ি বছর বয়েস, খনি-দুর্ঘটনায় মারা যায়। তার ঘর পুড়ে ধূলিসাৎ হয়ে যায়।

বোধ হয় তার ভাগ্যই তাকে একদিন রাশ্কায় নিয়ে এল। যত চোর, ভবঘুরে, ভিখিরি, মাতাল, রাজনৈতিক অপরাধী আর শ্রমিক-মজুরের ভীড় এই রাশ্কায়। এই শহরে সব সময় কিছু না কিছু হচ্ছে। প্রত্যেক মাসে এখানে মেলা বসছে। সড়ক আর রেলপথ এখান থেকে চারদিকে ছড়িয়ে গেছে।

শরীরটা তার ঝরে গেছে। সেই ঝরে-যাওয়া কাঠামোর মাপের কয়েক গুণ বড় মলিন জীর্ণ এক কনডাকটরের ওভারকোট তার গায়ে। মোটা খদ্দরের তার কৃষকের ট্রাউজারটি কোমরে দড়ি দিয়ে বাঁধা। সে জানে মাসের ঠিক কখন নিকটবর্তী খনি-বসতি থেকে আবর্জনা আর জঞ্জাল নিয়ে ট্রাক আসে। যখন আসে, তাকে অবশ্যই দেখা যায় ময়লা ন্যাকড়া, টিন, ঠোঙা, নোংরা কাগজ ইত্যাদি ঘেঁটে সে খনি-কর্মীদের ফেলে-দেয়া বুট খুঁজছে। শেষে সবচেয়ে কম-ছেঁড়া যে জোড়া সেই জোড়া বেছে নিচ্ছে। সে তার জুতোর সমস্যার এইভাবে সমাধান করে।

যত রকমের বাজে কাজ আছে তাই সে করে। কাঠে করাত চালায়, কুঠার চালায়, পানি আর নর্দমার পাইপের নল বসাবার খাল খোঁড়ে, বিলডিং উঠছে, সেখানে বালতি-ভর্তি চুন, সিমেন্ট বয়। রাত্রে শহরের প্রবেশ-মুখের এক সরাইয়ে প্রচুর মদ খায়, সরাই যতক্ষণ বন্ধ না হচ্ছে ওঠে না। তখন টলতে-টলতে হোঁচট খেতে-খেতে তার রাত্রি-নিবাসে, এক পরিত্যক্ত আস্তাবলে গিয়ে ওঠে।

লোকে তাকে 'কমরেড' বলে ডাকে। বাচ্চারা দেখলেই তার পিছু নেয়, তাকে নিয়ে মজা করে, হাসে। ডাকে: "এ কমরেড! তোমাকে দেখে বড় আনন্দ হলো, কমরেড! এই যে, কেমন আছ, কমরেড!" ইত্যাদি। ধ্যাড়ধেড়ে বুট পায়ে অ্যাসফল্টের ফুটপাথ ধরে ছেঁচড়ে-ছেঁচড়ে হাঁটতে-হাঁটতে মহা রাগান্বিত কণ্ঠে সে চিৎকার দেয়: ইহ্! কমরেড! কিসের কমরেড!

আবার বলে, কে তোর শালার কমরেড? কমরেড বলে কিছু নাই। চারদিকে খালি চোর থিক্-থিক্ করছে।

তার ঠোঁটের কোণে তখন ফেনা জমে ওঠে, কালসিটে কাঁধটা ফুলে ওঠে, নীল শিরাগুলি পরিষ্কার দেখা যায়। কিন্তু তবু বাচ্চারা পেছনে লেগেই রয়েছে।

শারদীয় মেলার হপ্তা-খানেক আগে কমরেড হলুদ রঙের এক-জোড়া নতুন ঝক্‌ঝকে বুট পরে বড় রাস্তা ধরে কোথায় খুব হেঁটে চলেছিল। বুটের সোল এই এতখানি পুরু, উপরের চামড়াও পরিষ্কার, চক্‌চকে। প্রতি পদক্ষেপে ফুটপাথে টক্কর মেরে-মেরে লোহার কাঁটায় সে আওয়াজ তুলছিল। পথচারীরা তো ওই দেখে এমন অবাক হয়েছে যে কমরেডকে নিয়ে রসিকতা করতে, মজা ওড়াতে ভুলে গেছে। ক্রমে ব্যাপারখানা জানা গেল। ওই হতভাগাকে মিলিসাভ্‌কা বেওয়া বহু যুক্তি-তর্ক আর অনুরোধ-উপরোধ করে তবে শেষ পর্যন্ত তার মৃত স্বামীর ওই বুট-জোড়া গ্রহণ করতে রাজি করাতে পেরেছে।

সারা বৈকাল কমরেড রেল-ওয়াগনে আপেলের বাক্‌সো বোঝাই করেছে। তারপর অন্ধকার হতেই সিধা সরাইখানায় গিয়ে উঠেছে। সকালবেলা কোঁচ-জেলেরা আর রাতের পালার শ্রমিকরা কমরেডকে একটা ডোবায় পড়ে থাকতে দেখল। মরা।

বৃষ্টি পড়ছে। রাস্তা বেয়ে ময়লা পানির ধারা বয়ে যাচ্ছে। শ্রমিকরা কয়েকটা বাতাবিলেবুর ডাল ভেঙে লাশটাকে ঢাকা দিল। কমরেডের খালি পা, আড়ষ্ট বিবর্ণ, ঘায়ে ভর্তি, সবুজ ডালের নিচে দিয়ে উঁকি মারছে। "চারদিকে খালি চোর থিক্ থিক্ করছে", এক মজুর বিড়্-

বিড়্ করে বলল। বৃষ্টি ঝরতেই থাকল। মজুররা তাদের ভেজা কোট ঘাড়ের উপর উঁচু করে তুলে পকেটের গভীর পেটে হাতগুলি ঢুকিয়ে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তাদের মুখগুলিতে অন্ধকার।

এক ঘণ্টা পরে জিপে চড়ে করোনার পাভ্লে আর পুলিশম্যান ইদ্জা এল। তারা এক নজর লাশ দেখল, তারপর বড় বাতাবিগাছের নিচে গিয়ে আশ্রয় নিল। পাভ্লে ঘাসে জুতো ঘষে-ঘষে কাদা ছাড়াল। ইদ্জা তার পকেট থেকে এক প্যাকেট সিগারেট বের করে মজুরদের দিয়ে নিজে একটা টানতে লাগল। মজুরদের হাতগুলি ঠাণ্ডায় জমে গেছে। পাভ্লে তার ময়লা নোট-বইয়ে দ্রুত কলম চালাতে লাগল, মজুরদের নাম, বংশনাম, জন্মস্থান, পিতার নাম, পেশা এই সব লিখে নিল। সে জানতে চাইল ঠিক ক'টায় লাশ দেখা গেছে। শেষে পাভ্লে ইদ্জাকে বলল, গরম ব্রাণ্ডি খেলে এখন কেমন হয় হে? ইদ্জা যেন প্রস্তুত হয়ে ছিল, সম্মতি জানাল। এক মজুর সরাইয়ে গেল ব্রাণ্ডি গরম করার কথা বলতে। একটা ট্রাক যাচ্ছিল, ইদ্জা থামতে ইঙ্গিত করল। মজুররা ট্রাকে লাশ তুলে সিমেন্টের বস্তার সঙ্গে রাখল। ইদ্জা ড্রাইভারকে নির্দেশ দিল, হাসপাতালে নিয়ে যাও।

তরুণ অন্তরীণ ডাক্তার পেরা হাসপাতালে ময়না তদন্ত করলেন। ডাক্তার খুব করে কিরে-কসম, খিস্তি কাটলেন, দিনটিকে, আবহাওয়াকে আর তাঁর চাকরিকে গাল পাড়লেন। পুরুষ নার্স বোলে কাটাকুটিতে ছিল। সে পরে জানাল, কমরেডের পেটে মাত্র কয়েকটা হ্যারিকট বরবটি ছিল, আর তার যকৃৎ মদে আর ক্ষতে একেবারে কুঁচকে এতটুকু হয়ে গিয়েছিল, কালো বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল। তার কোমরের নিচের অংশ থেকে অসহ্য দুর্গন্ধ বেরোচ্ছিল।

নগর পরিষদের লোক জাম্বোর কাজ ভবঘুরে বেওয়ারিশদের কবর দেয়া। গোর-খোদক কুব্জ সাভো আর ছুতার রায়কোকে খুঁজে বের করতে তার বেশ সময় গেল। এক হাজার দিনারে একটা কবর খুঁড়ে দিতে সাভোকে রাজি করাতে তার আরো কষ্ট গেল। আর রায়কো পাঁচ হাজারে কফিন আর একটা কাঠের ক্রুস বানিয়ে দিতে রাজি হলো।

রেডক্রসের ওঁরা জাম্বোকে একজোড়া নতুন আমেরিকান বুট দিলেন। দেয়ার সময় বললেন, একটা লোককে খালি পায়ে কবর দেয়া সে ভারি লজ্জার কথা।

কমরেডকে বিকালে কবর দেয়া হলো। বৃষ্টি তখনো ঝরেই চলেছে। হাসপাতালের গাড়ি গোরস্তানে এসে থামল। দু'জন পুরুষ নার্স কফিন কবরে নামাল, তারপর তাদের ট্রাউজারে হাত মুছল। তাদের একজন নাক ঝাড়ল। সাভো বেলচা দিয়ে কফিনের উপরে টিপটিপ মাটি চাপাতে লাগল। তখন তার কুঁজো পিঠ থেকে ধীরে-ধীরে সাদাটে বাষ্পের মেঘ উঠছিল।

য়েভ্‌রেম ব্‌কোভিচ

মালিশা পালোয়ান

সেদিন সেন্ট জর্জ দিবস, ১৯৪২ সালের ৬ই মে। গ্রামের কমিউনিস্ট কর্তৃপক্ষের কাছে মালিশা পালোয়ানের ডাক পড়ল। গ্রামের নাম লানিশ্‌তে। সে তার বাড়ি থেকে বেরিয়ে গ্রামের কেন্দ্রের দিকে যাচ্ছে যেখানে কমিউনিস্ট কর্তৃপক্ষের ভবনটি রয়েছে। এই ফাঁকে ওর সম্পর্কে আমি যা কিছু জানি আপনাদের বলছি।

সবাই তাকে বলে মালিশা পালোয়ান, যদিও ওটা তার নাম নয়। কৃষকের সঙ্গতি ও শক্তির মাপকাঠিতে বিচার করলে মালিশা ছিল সত্যিই শক্তিমান। তার এইসব জিনিস ছিল : দু'টি ঘোড়া, তিনটি বিপুল বলদ, একটা কুকুর--সব সময় গর্‌গর্‌ করছে, বিয়াল্লিশটা মৌচাক--মৌমাছি আর মধুতে ভর্তি, বাড়ি--তাতে রয়েছে ভূগর্ভভাণ্ডার, দেউড়ি আর দুই কক্ষ, সামরিক অফিসারের এক তরবারি যেটি সব সময় তার বিছানার মাথায় ঝোলে, ওবিলিচ মেডেল--লাল ইস্তাম্বুল কাপড়ের গেলাফে সেটি রাখা, দু'জোড়া বুট--একজোড়া নিত্যদিনের, অন্য জোড়া ছুটির দিনের এবং সম্ভবত কবরে যাওয়ার। এই সব ছাড়া মালিশার ঘরে সব সময় মজুদ থাকত ছয় কিলোগ্রাম পরিমাণ হলুদ স্কুতারি তামাক আর এক-পিপে ঘরে-তৈরি ব্রাণ্ডি। মালিশার ছেলেপিলে নেই। বউ আর ভাইকে নিয়ে থাকে। তার এই ভাইকে অস্ট্রিয়ানরা ১৯১৬ সালে খাসি করে দিয়েছে। সে বাড়ির ভেতরে আর চারদিকে সব সময় লক্ষ্যহীন ঘুরে বেড়ায়।

মালিশা গ্রামের ভেতর দিয়ে হেঁটে গেল, গ্রামের কমিউনিস্ট কর্তৃপক্ষের অফিস রয়েছে যে বাড়িতে সেখানে গিয়ে ঢুকল।

কমিউনিস্ট কর্তৃপক্ষের সবচেয়ে জাঁদরেল প্রতিনিধিটি বললেন, আপনাকে খাদ্য-সামগ্রী দিতে হবে।

মালিশা পালোয়ান বলল, যদি না দিই ?

কমিউনিস্ট কর্তৃপক্ষের সবচেয়ে মৃদুভাষী প্রতিনিধিটি বললেন, দিতে হবে। গণ-বাহিনী আর একটি মিশনকে আমাদের খাওয়াতে হবে।

আমি দেব না। আমার জিনিস আপনাদের দেব কেন?

কমিউনিস্ট কর্তৃপক্ষের সবচেয়ে বৃদ্ধ প্রতিনিধিটি বললেন, আপনাকে দিতেই হবে। আহতদেরকে আমাদের খাওয়াতে হবে। একজন ডাক্তার রয়েছেন, তাঁকে খাওয়াতে হবে।

তখন যত নরম গলায় সম্ভব, মালিশা জিজ্ঞেস করল, কখন দিতে হবে?

কমিউনিস্ট কর্তৃপক্ষের সেই জাঁদরেল লোকটি বললেন, কালকে। আপনি এই এখানে এনে দিন, আমরা যেখানে পাঠাবার পঠিয়ে দেব।

মালিশা এখন গ্রামের তেতর দিয়ে বাড়ি ফিরে চলেছে। এই ফাঁকে আপনাদেরকে মালিশার ভাই আর মালিশার বউ বিদ্না এই সময়টুকু এই বিষয়ে নিজেদের মধ্যে ঘরে বসে কী বলাবলি করছিল তাই শোনাব।

বিদ্না বলে, ওরা বুঝি তামাক চায়। কিছু মধুও বুঝি চায়।

মালিশার ভাই চুলোর পাশে যে চেয়ারটিতে সব সময় বসে থাকে সেখানেই বসে ছিল। বলল, শুনেছি ওরা সিগারেট খায় না, মদ খায় না। আর যদি মধু হয়, আহতদের জন্যে হবে। নিক্।

মালিশার অসুস্থ ভাই তার এই প্রিয় চেয়ারটি ছেড়ে একবারও ওঠে নি, সারা সকাল বসে রয়েছে। সে আবার বলল, মধু? মধুর আমাদের দরকারই বা কী? মধু আমরা খাইই না।

অতঃপর মালিশার ভাই কিংবা বউ কেউ আর কোনো কথা বলল না।

মালিশা বাড়ি ঢুকল, চুলোর পাশে একটা চেয়ারে বসল। অনেকক্ষণ পর সে একটি সিগারেট ধরালে তখন তার বউ তার সঙ্গে কথা বলল, ঠিক কী যে সে জিজ্ঞেস করল কেউ জানে না। মালিশার ওই বুদ্ধিভ্রষ্ট ভাই তো কিছুই বলল না। সেই ১৯১৬ সাল থেকে সে কারো সঙ্গে কথা বলে না। আর সেদিন সারা দিন মালিশাও কাউকে কিছু বলল না। পরে জানা গিয়েছিল, সেদিন সে দিনেও খায় নি, রাত্রেও খায় নি। তিনজন মানুষ একসঙ্গে থাকে, তারা কথা বলে না, এই রকম ঘটনা অন্য কোথাও ঘটলে সেটা নিশ্চয় অসহনীয় বলে মনে হতো। কিন্তু মালিশার বাড়ি এ নৈমিত্তিক ব্যাপার। জানা যায়, সেদিন রাত্রে ওরা

তিনজন যখন যার-যার বিছানায় শুতে যায় তখন পর্যন্ত ব্যাপার সেই একই রকম থাকে।

তখনো ভালো করে সকাল হয় নি, গ্রামে খবর ছড়িয়ে পড়ল, মালিশা পালোয়ানের বাড়ি পুড়ে গেছে, রাত্রে। গায়ে কাপড় জড়াতে জড়াতে পুরুষরা আর খালি পায়ে মেয়েরা তার বাড়ি গিয়ে যখন পৌঁছায়, দেখে, তার আগেই আগুন নিভে এসেছে, ঘরের নগ্ন শূন্য দেয়াল দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর একবার সবাইকে সেই পরিচিতি মৌনতা এসে ঘিরে ধরল, তবে এবারের ব্যতিক্রম হচ্ছে, এবারের মৌনতা তপ্ত। মালিশার পোড়া বাড়িতে প্রথম কে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল তা আর কখনো জানা যাবে না। বেশ ক'জন কৃষকই সেই বাহাদুরির দাবি নিয়ে তর্ক চালাচ্ছে। কিন্তু সবার মুখে কাহিনী সেই একই। সে কাহিনী এমন কিছু বড়ও নয়। বাড়ির সবকিছু এবং গোলা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। ঘোড়া, বলদ, গাই, গেরস্থালির জিনিসপত্র সবকিছু পুড়ে গেছে। গিয়ে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে এই জিনিসটি জানতে কারো আর বাকি রইল না।

মালিশার বউ বিদ্‌না আতঙ্কে যেন জমে গেছে, সম্ভবত এই নিশ্ছিদ্র নীরবতায় সে হতবুদ্ধিও হয়ে পড়েছে। মালিশার পাশটিতে সে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মালিশার গায়ে আগুন লাগে নি। কিন্তু তবু তাকে মৃত পড়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে। বিদ্‌নাকে কেউ অশ্রুপাত করতে দেখল না। দেখা গেল সে কেবল সিগারেট টেনে চলেছে। মালিশার ভাই (তার নাম আর জানার দরকার নেই, কারণ সবাই তাকে ওই মালিশার ভাই বলেই ডাকে) বাড়ির সামনে বিদ্‌নার পাশে একটা সাদা পাথরের উপর শান্তভাবে বসে রয়েছে।

সবাই জানতে চাইছে, মালিশাকে কে খুন করল? মালিশার বউ কিছুই বলছে না। তাকে বার-বার প্রশ্ন করার পর লোকে শেষে মালি-শার ভাইয়ের দিকে তাকাল। কিন্তু সেও কিছু বলবে না।

শেষে নারী-পুরুষ-শিশুর বিরাট এক দল যখন মালিশার অনামা ভাইকে চারদিক থেকে গিয়ে ঘিরে ধরল, সে সাদা পাথর ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, মৃদু কণ্ঠে সহজভাবে বলল, আমি আমার ভাইকে, মালিশাকে, খুন করেছি। ও যখন ঘরে আগুন দেয়, আমার চেয়ারটাও পুড়ে যায়।

আমাদের ও ঘুম থেকে জাগিয়েছে খুব দেরি করে। তখন আর আমার ওই চেয়ারে, বুঝলেন, হাত দেয়ার সময় ছিল না, তখন ওটা জ্বলছে।

পরদিন আমাদের স্থানীয় কমিউনিস্ট কর্তৃপক্ষ এই সমস্ত ব্যাপারটা সম্পর্কে একটা রিপোর্ট তৈরি করে। সেই রিপোর্টখানায় যে কী ছিল এমনকি আজও তা পড়ে দেখা যেত যদি লিভারস্কি স্থানীয় কমিটির বাড়িটি ঠিক যুদ্ধের পরে না পুড়ে যেত।

য়োভান লুবারদিচ

সবার গল্প

তখন রাতের খাওয়ার সময়। নিমেষে সবাই টেবিলের চারপাশে এসে জমল। বাবা, দুই ছেলেমেয়ে, ছেলের বয়স দশ, মেয়ের ছয়। আর দাদু।

বাবা গলা চড়িয়ে বলল, এই, তোরা কি চুপ করবি না?

বাচ্চারা একটুখানি চুপ করল। ছেলে গোপনে থালায় চামচ ঘষতে লাগল, কিন্তু ওই কর্ম করার সময় বাবার মুখের দিকে নির্দোষ মুখ করে তাকিয়ে রইল।

বাবা আবার বলল, এই, আমার কথা তোদের কানে যায় না? ধেত্তেরি! আমি কি এ-বাড়ির কেউ নই? আমাকে একটু শান্তিতে শুনতে দে তোরা!

বসার ঘরে ওরা খাচ্ছিল। কোণে জানালার পাশে টেলিভিশন-সেটটি। খবর হচ্ছে।

মা খাবার নিয়ে এল। চীনামাটির ভর্তি গামলা, ভাপ উঠছে।

দাদু কলরব করে উঠলেন, বা বা, চমৎকার গন্ধ বেরিয়েছে, বউ-মা। আজ দেখছি ডবল খাব।

মা তিরস্কার করে বলল, বাবা, আল্লার দোহাই, ওহ্...

খুকু মুরুব্বির মতো গলা করে বলল, দাদু, তুমি দেখতে পাচ্ছ না বাবা খবর শুনছেন?

বাবা রাগে ভ্রূ কুঁচকে গভীর মনোযোগে টেলিভিশন দেখতে লাগল। এখন স্থানীয় খবর দিচ্ছে। এবং তখনি সে আবার মাথা ঝাঁকিয়ে হাত নেড়ে বলল, এই খোকন, কে রে, কে শব্দ করছে?

টেবিলের উপর দিয়ে একটা শান্ত দীর্ঘশ্বাস বয়ে গেল। থালায় চামচ ঘষার শব্দ শোনা গেল।

খুকু তীক্ষ্ণ গলায় বলে উঠল, বাবা, দেখো দেখো...!

তার ভাইয়ের মুখ কিন্তু একেবারে নির্দোষ। সে বলল, কী রে, কী?

খুকুর মুখের রং বদলাতে লাগল, বুঝি কেঁদে ফেলবে। বলল, টেবিলের তলায় আমাকে লাথি মারছে, বাবা!

কাতর স্বরে খোকন বলল, মিথ্যে কথা! সত্যি আমি লাথি মারি নি।

ওদের মা দু'জনকে থামিয়ে বলল, চুপ্, সব চুপ্। তোদের আজ হয়েছে কী!

বাবা চুপচাপ খাচ্ছে। দাদু ফু ফু করে মুখ থেকে ধোঁয়া বের করতে লাগলেন। বললেন, ওরে আল্লা, গরম কী! আমার মুখের তালু পুড়ে গেল।

খোকন দুষ্টু আওয়াজে বলল, আস্তে আস্তে খাও, পেটুকের মতো খেয়ো না।

বউ স্বামীকে বলল, দ্রাগো, ওয়াশিং মেশিন আবার খারাপ হয়েছে। আর, দু'হপ্তা ধরে তোমাকে বলে চলেছি, ইলেকট্রিক কফি-গ্রাইণ্ডার কাজ করছে না।

জানি।

তাহলে ওটাকে ঠিক করার জন্যে একটা লোক আনছ না কেন। নাকি সেটাও আমাকে করতে হবে?

স্বামী ভ্রূ কুঁচ্কে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে রইল, খেয়ে চলল। বলল, ব্রাণ্ডি দাও।

খুকু আবার গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, বাবা, দেখো!

বাবা ধমক লাগাল, থাম্ বলছি! উহ্, আর সহ্য হয় না।

টেলিভিশনে সিসিলিতে নতুন করে ভূমিকম্প হওয়ার সংবাদ-প্রতিবেদন হচ্ছিল। ধ্বংস, কালো পোশাক পরা কিছু মেয়ে, তাদের মুখগুলি রোদে-পোড়া, যেন শুকনো ফাটল-ধরা মাটি। একটা পরিত্যক্ত কুকুর, টানা সুরে কাঁদছে।

মা বলল, খাচ্ছ তো মুখের ভেতর অত শব্দ কিসের?

দাদু বললেন, আর কিছু আছে?

বাবা ধমকাল, চুপ!

বাবা হাঁ করে টেলিভিশন দেখছে, যান্ত্রিকভাবে চামচে করে মুখে খাবার তুলছে এবং চিবোচ্ছে তো চিবোচ্ছেই। এক চামচ-ভর্তি খাবার হাঁ-করা মুখের কাছে গিয়ে অমনি থেমে আছে।

মা মরিচের মিষ্টি সালাত দিতে-দিতে বলল, আহা, বেচারারা।

খাবার-ভর্তি ফোকলা মুখ নড়াতে নড়াতে দাদু যোগ করলেন, ওই গরীব বেচারিদের ভাগ্য সব সময় ওই রকম। ওদের ভাগ্যে সবচেয়ে খারাপ সব দুর্ভোগ। বুঝলে, এর আর অন্যথা নাই।

স্বামী বউকে জিজ্ঞেস করল, কফি কিনেছ?

খোকন চেঁচিয়ে উঠল, বাবা, দেখো।

এখন ওরা ভিয়েতনামের খবর দিচ্ছে। সবাই সেটের দিকে মুখ ঘোরাল। পর্দায় সায়গনের পথ-যুদ্ধের দৃশ্য ভেসে উঠল। একটা লোক বাইসাইকেল ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। একটা মেয়ে তার বুকে করে একটা শিশুকে নিয়ে যাচ্ছে। এক বৃদ্ধের কোঁচকানো ফাটা মুখ ভেসে উঠল। মনে হয় যেন এদের এই খাদ্য-বোঝাই টেবিলের দিকে উদগ্র চোখে তাকিয়ে রয়েছে।

দুই সৈনিক এসে দাঁড়াল, ওরা একজনকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। লোক-টার গায়ে শার্ট আর খাটো ট্রাউজার, দেখতে ছেলেমানুষ। ইউনিফর্মপরা একটা লোককে দেখা গেল। উঁচু কপাল, আর মাথার পেছনটা তার চ্যাপটা। সে মাথা সোজা করলে সবাই দেখল তার হাতে ছোট কালো পিস্তল। খাটো ট্রাউজার পরা, ছেলেমানুষের মতো দেখতে বেসামরিক লোকটার দিকে সে পিস্তল তাক করল। ছোট কালো নলটিতে তার কপাল ছুঁতে দেখা গেল। লোকটা তার চোখ-দু'টি ঘোরাতে লাগল। একটা গুলীর শব্দ শোনা গেল, সে মাটিতে পড়ে গেল। তার পা-দু'টি মাত্র কয়েকবার নড়ল, তারপর স্থির হয়ে গেল।

খোকন আশ্চর্য হয়ে বলে উঠল, কিন্তু বাবা, ও তো ওকে মেরে ফেলল।

খুকুর চামচ মেঝেয় পড়ে গেছে। সে তার উপর পা ঘষে শব্দ করছে।

তার মা বলল, এই যে মেয়ে, দেখতে পাও না তুমি কী করছ?

আকাশ-পাতাল ভাবতে ভাবতে খোকন তার থালা-ময় ভাতগুলি নাড়াচাড়া করছে। তার বাবা গেলাসে ব্রাণ্ডি ঢালল।

দাদু বললেন, আমাকে একটু ফলের স্টু দেবে, বউ-মা?

মা খুকুকে বলল, চামচ মুছে খাও, থালায় যেন একটা দানা পড়ে না থাকে, হ্যাঁ।

দাদু কাঁচুমাচু করে বললেন, একটু ফল হবে, মা?

খুকু বলল, মা, আমি আর খেতে পারছি না, সত্যি।

তার বাবা গেলাসে আবার ব্রাঁণ্ডি ঢালল। গামলা থেকে আরো দু'চামচ ভাত তুলে নিল। তার টেলিভিশন দেখা হয়ে গেছে। মামুলি কিছু স্থানীয় খবর দেখানো হচ্ছে। সড়ক-নির্মাণ বা এই ধরনের সব জিনিস।

খোকন থালায় চামচ দিয়ে ভাত নাড়তে নাড়তে বলল, বাবা, ও ওকে মেরে ফেলল, সত্যি বলছি, মেরে ফেলল।

বাবা বলল, খাও, খেয়ে ওঠো।

মা হঠাৎ দাদুর উপর রাগ করে চেঁচিয়ে উঠল, হায় আল্লা, দেখো কাণ্ড! আপনার ফলের স্টু যে নিচে পড়ছে! প্রত্যেক দিন আমি টেবিল-ক্লথ ধুতে পারব না।

খুকু বলল, মা, আমি আর সত্যি খেতে পারছি না, সত্যি পারছি না।

মা খুকুকে বলল, যাও দাঁত মাজো-গে, পা ধোও-গে, তারপর গিয়ে শুয়ে পড়ো।

তারপর ছেলের দিকে মুখ ফেরাল। ছেলে চামচ দিয়ে থালায় সেই ভাত নাড়ার খেলা খেলেই চলেছে আর টেবিলের নিচে পা বাজিয়ে চলেছে। মা তাকে বলল, শুনেছ? এই যে, তোমাকেও বলছি।

আবার বলল, হায় আল্লা, এই যে, আপনি দেখতে পান না আপনার ফলের স্টু কোথায় পড়ছে?

বাবা বলল, যাও, সব শোও-গে।

মা উঠে টেবিল পরিষ্কার করতে লাগল।

খোকন বলল, আমার ফল যে এখনো খাওয়া হয় নি?

বাবা বলল, জলদি খাও, শেষ করো, তারপর মুখ ধোও-গে যাও।

সে হাত দিয়ে তার সামনের টেবিল-ক্লথ থেকে উচ্ছিষ্টগুলি ঝাড়তে লাগল।

অচিরে পাশের কামরা থেকে হুটোপুটির চাপা শব্দ ভেসে আসতে লাগল। মা দরজা খুলে চিৎকার দিল, এই যে দুই-জনা, আমার কথা শুনতে পাচ্ছ? কী, আনব নাকি?

দাদু আঙুল দিয়ে তাঁর ফোকলা দাঁতের মাড়ি খোঁচাতে লাগলেন।

ঝঙ্কার তুলে মা বলল, ওহ্, সত্যি···

বাবার হাতে ব্রাণ্ডির গেলাস ছল্‌কে উঠল। নাকের মধ্যে শব্দ করে বলল, ওটা বন্ধ করে দাও।

দাদু নিজেকে টেনে তুলে তাঁর কামরায় চলে গেলেন।

স্বামী জিজ্ঞেস করল, গত রবিবারের কাগজটা কই?

স্ত্রী বলল, হ্যাঁ গো, দেখলে? ওদের বিচার-বিবেচনা বলে কিছু আছে? ওই সব নিষ্ঠুর কাণ্ড ওরা অন্য কোনো সময়ে দেখাতে পারে না? তুমি দেখেছ খোকনের খাওয়া কোথায় গেল?

স্বামী খবরের কাগজে শব্দ তুলে বলল, হ্যাঁ।

টেলিভিশনের ওই গর্দভগুলোকে লিখে পাঠানো উচিত। মানুষ যখন খেতে বসেছে ঠিক সেই সময় ওই সব দেখাতে হবে?

পাশের ঘরে দাদুর কাতর চিৎকার শোনা যাচ্ছে: আমার চপ্‌পল কই? আমার চপ্‌পল কোথায়? মিলোয়কা, আমি কী বলি শুনতে পাও না? বলি, আমার চপ্‌পল পাচ্ছি না।

বউটি কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলে, এই আপনি আর আপনার চপ্‌পল! ওহ, আমি আর পারি না, আমি পারি না!

স্বামীটি খবরের কাগজ পড়া শেষ করে হাসল। সে যা পড়ল সেটি হচ্ছে সুইডেনের যৌন-বিপ্লবের গল্প।

রাঙ্কো সিমোভিচ

অগ্নিকাণ্ড

ক্লান্তিতে শরীর ভারি হয়ে উঠেছিল। অবসন্নভাবে সে একটা খালি আসনে গিয়ে বসল। মহা ভারি কোনো ধাতব বস্তুর মতো শরীরটা যেন চেপে বসে গেল। তখন মনে হলো সে ধীরে ধীরে বালির স্তূপের মতো ক্ষয়ে যাচ্ছে, হাল্‌কা হয়ে যাচ্ছে।

কাছাকাছি কেউ ছিল না। হলের মধ্যে কিছু দূরে শ্রমিকরা বসে রয়েছে, কথা কইছে। ওদের মুখগুলিকে এবং আর সব কিছুকে সে প্রথম প্রথম চোখে ঠিকই দেখতে পাচ্ছিল। কিন্তু তখন যেন সব ঝাপসা হয়ে এল। সে যেন পড়ে যেতে লাগল, ধীরে ধীরে। পড়তে পড়তে ওই সব গুঞ্জনের ভেতর ভাসতে ভাসতে তলিয়ে যেতে লাগল। চারপাশের লোকজনের সঙ্গে তার যে স্থান-কালের যোগ তার বোধ সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে যেতে লাগল। মনে হলো এই অবস্থার চেয়ে তার যদি মৃত্যু হতো সেও ভালো ছিল। তাহলে পরম সুন্দর এক নিঃসঙ্গতার মধ্যে সে হারিয়ে যেতে পারত।

জনে জনে কার কোন্ গলা তাও সে চিনতে পারছিল না। কখন যে ওরা চুপ করেছে, সভা শুরু হয়েছে তাও সে লক্ষ্য করে নি। কেবল সভাপতি যখন বললেন, "আমাদের পরবর্তী বিষয় নৈশ প্রহরী ব্লাগোয়ের মামলার শুনানি" তখন সে তার অগভীর মনোযোগ আর বিচ্ছিন্ন চিন্তাস্রোত নিয়ে সভার কাজে যোগদান করল।

আগুন লাগার কারণ, ক্ষতির পরিমাণ, এবং এ-বিষয়ে তার দায়িত্ব সম্পর্কে সাক্ষ্য উপস্থাপিত হতে থাকলে ব্লাগোয়ে মনে-মনে আবার একবার অগ্নিকাণ্ডের আগের ঘটনা ও দিনগুলোর ধারাবাহিক ছবির উপর দিয়ে পদযাত্রা শুরু করল, যেন লাঙল তার পেছনে যে কর্ষণের দাগ ফেলে গিয়েছিল তার উপর ঘুরে এসে আবার দাগ টানছে।

মামলায় বর্ণিত প্রতিটি শব্দ স্পষ্ট ও অকাট্য। কিন্তু তবু আবার কী কারণে যেন এর কোনো কিছুর জন্যেই সে দায়ী নয় বলে মনে হতে লাগল। তার মনে হলো যেন জীবনের একপাশে-ছুঁড়ে-ফেলে-

দেয়া কিছু সুদূর স্বপ্নকে পুনরায় কুড়িয়ে আনা সম্পর্কিত কোনো তদন্তে সে উপস্থিত হয়েছে।

দশ বছর ওই কারখানায় সে পাহারা দিয়েছে, প্রত্যেক রাত্রে, এক জায়গায়, শীতে গ্রীষ্মে, বর্ষণের রাত্রে, জ্যোৎস্না-রজনীতে। একা। সঙ্গে থেকেছে শুধু তার কোম্পানির চিন্তা আর তার নিজের ছায়া। হয়তো কখনো দু-একজন পথচারী হেঁটে যাচ্ছে, তাদের দিকে তাকিয়ে থেকেছে, যেন পাখির উড়ে চলে যাওয়া দেখছে। নৈশ প্রহরীর প্রকোষ্ঠের সামনে সামান্য আঙিনাটিতে পায়চরি করছে, আর একেবারে নির্ভুল বুঝতে পারছে ঠিক কোন্ নুড়িটি তার বাঁ পায়ের, কোন্‌টি ডান পায়ের জুতোর পাতলা সুকতলার ভেতর দিয়ে গিয়ে বাজছে। আগের রাত্রে দেখে নি এমন কোনো একটি নতুন জিনিস বা কোনো অন্য রকম কিছু সে বিশেষভাবে লক্ষ্য করছে।

এবং তার কেবল ওই কর্মস্থল নয়, তার জীবনের অন্য সব কিছু ছিল তার ওই রকম চেনা আর অপরিবর্তিত। ছেলেমেয়েরা বড় হলো, তার ও তার বউয়ের বয়েস আরো গড়িয়ে গেল, তার বেতন বাড়ল, তার ক্রমবর্ধমান প্রয়োজন আর সাংসারিক দায়-দায়িত্ব ইত্যাদির সঙ্গে ওই বৃদ্ধি কোনো রকমে তাল মিলিয়ে চলল, একটি দুটি করে তার ঘরে দরকারি কিছু ফিটিং আর আসবাব এলো। এই হচ্ছে তার পরিবর্তন। এ পরিবর্তন আর কিছুই নয়, তার জীবনযাপনের এক রকমের একমুখী গতি।

তার জীবনে যদি কখনো সামান্যতম বা অতি-অপরিহার্য কোনো পরিবর্তনও ঘটেছে তাতেই সে সংশয়ে আর কী যেন অজানা ভয়ে কণ্টকিত হয়ে উঠেছে। ভাবপ্রবণতা বা আবেগকে সে কখনো প্রশ্রয় দেয় নি, এবং তার নিজের কাজ সে যেভাবে করতে অভ্যস্ত তাকে অন্য রকম বা নতুনভাবে করার কোনো চেষ্টা সে কখনো করে নি।

একদিন বউ বলল, বলাগোয়ে, এই যে দেখো, এই দ্বিতীয়বার তুমি তোমার শেভিং-এর জিনিসপত্তর তাকের বাম দিকে রাখলে। সব সময় ওগুলো তুমি ডানদিকে রাখো।

এই যে হুশিয়ারি, এ-সম্পর্কে সে দীর্ঘক্ষণ ধরে ভাবল। তার এই অহেতুক ও তাৎপর্যহীন অন্য রকম কাজ তার বউকে বুঝি প্রায়

দিশেহারাই করে তুলল। ওটা একটা আকস্মিক ঘটনা ঠিকই। কিন্তু আকস্মিক ঘটনাই বা ঘটবে কেন।

এবং এইভাবেই সে তার জীবনের দিনগুলি কাটিয়েছে, ধীরে, সমান তালে। আনন্দ আর সুখ যা পাওয়ার, ছোট-ছোট জিনিস, সামান্য সামান্য ঘটনা থেকেই পেয়েছে।

তখন একদিন, পাঁচ বছর আগের কথা, নৈশ প্রহরার ডিউটি করছিল, এক নতুন পথচারীকে দেখল, এক স্ত্রীলোক, ও তার পাহারার এলাকায় সবচেয়ে কাছের বাড়ির একটি ফ্ল্যাটে সম্প্রতি উঠেছে। খুব সকালে মেয়েটি কাজে বেরিয়ে যায়, আর ফিরে আসে প্রায়ই বেশ রাত করে যখন বলাগোয়ে কেবলে তার নতুন পালার ডিউটি শুরু করে। বেশ প্রাণবন্ত ভঙ্গিতে ঠাটের সঙ্গে মেয়েটি হাঁটে, কেমন যেন উজ্জ্বল আশাবাদ ছড়াতে ছড়াতে যায়।

অনেকদিন এই পথে মেয়েটি যাতায়াত করার পর তখন একদিন একে অপরকে শুভ-সম্বোধন জানাতে শুরু করল। তখন সে জানতে পারল মেয়েটি বিবাহিতা। তারপর তাকে বিষণ্ণ চেহারার এক লোকের সঙ্গে নিয়মিত দেখা যেতে লাগল। কিন্তু এই লোক কখনো তাকে 'হ্যালো' বলে সম্বোধন করল না। দু-বছর পর দেখা গেল মেয়েটি আবার একা-একা কাজে যাচ্ছে, একা-একা ফিরছে। শুনল, তার ডাইভোর্স হয়ে গেছে, তার স্বামী তার ফ্ল্যাট ছেড়ে চলে গেছে।

বলাগোয়ে কখনো কখনো নিজে নিজেকে প্রশ্ন করত, সব বাদ দিয়ে কেন সে এই স্ত্রীলোকের জীবনের এই পরিবর্তন অত মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করছে। কিন্তু ওই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে সে কখনো তার গোপন ভাবনা আর বাসনার অভ্যন্তরে দৃষ্টিপাতের চেষ্টা করে নি।

সে তার সম্পর্কে তার কাছ থেকে আরো অনেক কিছু জানতে পারল। কারণ সে ইতিমধ্যে কয়েকবার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে দু-একটি বাক্য-বিনিময় করেছে। একবার সে কফি তৈরি করে নিয়ে এল তার সঙ্গে খাবে বলে। সেবার তো তারা অনেকক্ষণ ধরে কথা বলেছিল। বলাগোয়ে কারখানার আঙিনা থেকে, আর সে রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা বলেছিল।

বলাগোয়ে মনে-মনে বলল, মেয়েটা বেশ ভালো। কিন্তু, কী আশ্চর্য, ওর সঙ্গে ওর স্বামীটার বনল না কেন।

মেয়েটা জানাল, সে এক কারখানায় ক্যানটিনে সহকারী রাঁধুনী, তার নাম আন্না, আর তার বয়েস হয়েছে পঁয়ত্রিশ বছর। বলাগোয়ে আনমনে হিসাব করে দেখল, সে ওর চেয়ে মাত্র সাত বছরের বড়।

আন্না! মনে হচ্ছে এই নাম যেন তাকে কত কিছু উদ্‌ঘাটন করতে সাহায্য করেছে। এতটুকু নাম! সামান্য একটি হালকা নিঃশ্বাসে, সকালের বাতাসের মতো হালকা নিঃশ্বাসে, বলে ফেলা যায়।

আন্না! নামটি ওই মেয়ের দেহের অবয়বের সঙ্গে কী সুন্দর মিল খেয়েছে। দ্রুত, উৎফুল্ল, শান্ত, তৎপর। আন্না, আন্না, আন্না! নামটা যেন কাঠের খোঁটার মতো তার মস্তিষ্কের গভীরে বসে যেতে থাকে।

তখন কী হলো, ক্রমে তার ওই নাম বড় থেকে আরো বড় হয়ে যেতে লাগল, তার চারদিকে নিয়ন-বিজ্ঞাপনের মতো বৃত্ত গড়ে উঠতে লাগল। মনে হলো, দীর্ঘশ্বাস-ভরা কণ্ঠে সে নিজেই নিজেকে ওই নাম শুনিয়ে চলেছে, যেন নাম জপছে, দুটি হরফের একটিকে আর একটির পর জপতে জপতে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসছে। হৃদয়ের আরো গভীরে তখন মনে হয় সূচ ফুটছে, তাতে ব্যথা বাজছে, আবার মনে হয়, সূচ ফুটছে কিন্তু ব্যথা বাজছে না।

তখন সে একটা দায়িত্ব বোধ করতে লাগল। সে আর কিছুই নয়, আন্নার ফ্ল্যাটটিকে আর আন্নার স্বপ্নগুলিকে পাহারা দেয়া। এক চোখ সে পেতে রাখে কারখানার চারদিকের রেলিঙের উপর, অন্যটি আন্নার জানালায়। জানালার পর্দা টানা না থাকলে সে তাকে তার কক্ষে দেখতে পায়। এবং ওই দিকে তাকিয়ে সে অপেক্ষা করতে থাকে, কখন সে বাতি নিভিয়ে দেয়, তখন বুঝতে পারে সে শুতে যাচ্ছে।

আন্না কয়েকবার কফি নিয়ে এসেছে। একদিন সে তার সঙ্গে রেলিঙের সামনে বেঞ্চিতে বসল, বসে জানাল, বলাগোয়ে নাকি বড় চমৎকার মানুষ। তার মনে হচ্ছে সারা জীবনের জন্যে তারা পরস্পর বন্ধু হতে চলেছে।

তখন সঙ্গে সঙ্গে বলাগোয়ে বুঝতে পারল এই রকমের একটি কথার জন্যে সে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করে বসে আছে। হয়তো আসলে

আন্না যা বলছে তার চেয়েও সে মধুর কিছু চিন্তা করছে। তখন বলাগোয়ে কোনো স্ত্রীলোক যেমন করে কাপড়-শুকানো তারে সাদা ধোয়া কাপড় রোদে মেলে দেয় সেই রকমভাবে আন্নার মুখটিতে আর দেহটিতে তার আশাগুলিকে বিছিয়ে দিল।

তখন এক সমস্যাকে নিয়ে তার টানাহেঁচড়া শুরু হয়ে গেল। এখন আন্নাকে সে কোন্ কথা বলবে। তখন সর্বদা উন্মত্ত অধৈর্যের সঙ্গে সে এই নিয়ে ভাবতে লাগল। উপযুক্ত মুহূর্তটির অপেক্ষা করতে লাগল। কিন্তু কত মুহূর্ত আসে যায়, একটাকেও কখনো সম্পূর্ণ উপযুক্ত বলে মনে হয় না।

যেদিন অগ্নিকাণ্ড হলো তার আগের সন্ধ্যায় কারখানার প্রবেশ-মুখের সামনে ওরা দাঁড়িয়ে ছিল। তখন সে বলে উঠল, ওহ্ আন্না, আমি তোমাকে ভালোবাসি।

দীর্ঘকাল ধরে সে তাকে এই কথা বলবে বলে বসে রয়েছে। সেই সন্ধ্যায়, স্ফীত নদী যেমন বাঁধের উপর ভেঙে পড়ে, সেই রকমভাবে তার অভ্যন্তরের কোনো ঝিল্লির মধ্য দিয়ে এই শব্দ-কয়টি ভেঙে পড়ল।

কয়েক মুহূর্ত আন্না তার দিকে সংশয় নিয়ে অনিশ্চিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল, তারপর তার মুখে হাত বুলিয়ে আদর করল এবং দ্রুত পালিয়ে গেল। সে গিয়ে তার ফ্ল্যাটের বাতি জ্বালল না। কিন্তু বলাগোয়ে বুঝতে পারছিল সে তার অন্ধকার ঘরের বন্ধ জানালা দিয়ে তাকেই দেখছে।

সকালে সে তাকে কাজে যেতে দেখল না, সন্ধ্যায় যখন ডিউটিতে ফিরে এল তখনো তাকে দেখা গেল না। জানে না সে তার ফ্ল্যাটেই রয়েছে, না বাইরে কোথাও গেছে। সে কি তাকে নিয়ে কৌতুক করছে, নাকি দরদ কিছু আছে তার মনে। আন্না সেই তখন এত দ্রুত হেঁটে চলে গিয়েছিল যে এর চেয়ে বেশি আর কোনো ভাবের খেলা তার মুখে দেখতে পাওয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু সে যে দেখতে চায় সবকিছু।

সে উত্তেজিত ও অধৈর্য বোধ করতে লাগল। তার মেরুদণ্ডে শিহরণ খেলে বেড়াতে লাগল। আগুনে ভালো করে ইন্ধন দিল, যদিও বাইরে

এমন কিছু শীত নয়। চুলা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল, কিন্তু তবু সে কাঁপছে। যেন মাত্র একখানা জামা পরে সে বরফের উপর শুয়ে রয়েছে। সে নিজেকে প্রশ্ন করল, আমার কী হয়েছে? আমার কোনো অসুখ নাকি? যদি একটুখানি কাউকে এখানে ডিউটিতে রেখে ওর ফ্ল্যাটটা দৌড়ে গিয়ে দেখে আসতে পারতাম। এই তো হাতের কাছে, মাত্র এক মিনিট লাগবে।

সে যখন সিঁড়ি ভেঙে উঠছিল তার হাঁটু আর চিবুক কাঁপছিল। বাইরে থেকে দেখেছে ভেতরে বাতি জ্বলছে না। ধরে নিয়েছিল আন্না নেই। কিন্তু আছে কি নেই সেইটাই দেখতে হবে। সে টোকা মারল।

আন্না ডাকল, ভেতরে এসো।

সে বিছানায় শুয়ে ছিল। এবং তার গলা শুনে পরিষ্কার বোঝা গেল সে তার জন্যেই অপেক্ষা করে আছে। নদীকে যেমন তার মোহানায় অবধারিত ছুটে যেতে হয়, সেই রকম সেই মুহূর্তে তাদেরও একজনের অপরের আলিঙ্গনে এসে আবদ্ধ হওয়াটা অবধারিত ছিল।

এর বেশি তার আর পরিষ্কারভাবে কিছু মনে নেই। হঠাৎ ভয়ানক আগুনের শিখায় তারা চমকে উঠেছিল, আগুনের ঝলক জানালার বাইরে কাঁপছিল। তখন তারা চিৎকার শুনতে পেল, দমকলের তীব্র সাইরেন শোনা গেল। ততক্ষণে দমকল কারখানার আঙিনায় ঢুকেছে। ভয়ে আর ভয়ংকর হতাশায় সে পাথর হয়ে গেল, উঠে বাইরে যাবে তার ক্ষমতাটুকু লোপ পেয়েছে। বালিশে মাথা চেপে ধরে অসহায়, শূন্য যন্ত্রণায় কেঁদে উঠল, একটা ভয়ংকর কণ্ট তার পেটের ভেতর খামচাতে লাগল।

সমবায়ের নিকট এই মর্মে প্রতিবেদন গেল যে নৈশ প্রহরীর প্রকোষ্ঠের অতিরিক্ত প্রজ্জ্বলন্ত চুলা থেকে অগ্নিকাণ্ড হয়। আগুন নিয়ন্ত্রণ করা যেত যদি উক্ত প্রহরী কারখানায় তার ডিউটিতে থাকত। খুবই বড় ক্ষয়-ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

ঘ্লাগোয়ে আত্মপক্ষ সমর্থন করে কিছুই বলল না। মাথা নেড়ে স্বীকার করল তার অজুহাত বা ওজর কিছু নেই এবং যা কিছু বলা হয়েছে তা সত্য বলে মানে।

তাকে সংস্থা থেকে বাদ দেয়ার প্রস্তাব যখন উপস্থাপিত হচ্ছিল ঠিক তখন তার মনে একটা ভাব খেলে গেল। সেটি হচ্ছে এই যে তার জীবন ও কর্মের অটল শৃঙ্খলা যে ওই একবার প্রবল ও অপ্রতিরোধ্যভাবে বিঘ্নিত হয়েছিল তার জন্যে তার প্রকৃত কোনো মনস্তাপ নেই, যদিও সে জানে, এর জন্যে পরে যা-কিছু ঘটল তার জন্যে সহকর্মীদের কাছে এবং স্ত্রী ও পুত্রকন্যাদের কাছে তাকে জবাবদিহি করতে হবে, এবং এর জের বহু কাল চলবে। তার ভাগ্যের কাছেই সে অভিযুক্ত হয়ে গেছে। এই ভাগ্য, কখনো কখনো, যারা আকস্মিকভাবে একটা অপরাধ করে ফেলে তাদেরকে যারা আদ্যোপান্ত ভুল পথের পথিক তাদের চেয়ে অধিক শাস্তি দিয়ে থাকে।

অধিকাংশ শ্রমিক প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিল। তারা নিঃশব্দে সব হাত তুলল। কিন্তু ব্লাগোয়ের মনে হলো সে এক বিরাট জনসভায় বসে রয়েছে। যেখানে বক্তা এক জনতাকে উত্তেজিত করার জন্যে চিৎকার করে বলছে: "বিশ্বাসঘাতক আর অগ্নিসংযোগকারীরা নিপাত যাক।" এবং হাজার হাজার কন্ঠ তার জবাব দিচ্ছে: "নিপাত যাক, নিপাত যাক।"

সভাপতি বললেন, "সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে নৈশ প্রহরী ব্লাগোয়ে-কে সমবায় থেকে বাদ দেয়া হলো। আমি অতঃপর সভার সমাপ্তি ঘোষণা করছি।"

ধীরে ধীরে বিষণ্ণভাবে শ্রমিকরা সব হল ত্যাগ করল। ব্লাগোয়ে সোজা সামনে তাকিয়ে রইল। একা হওয়ার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল। তারপর উঠে দাঁড়াল, বাইরে বেরোল। করিডরে দু-তিনজন শ্রমিক থেমে দাঁড়াল, তার যাওয়ার পথ করে দিল। তাদের ভাব হচ্ছে তারা যে তার জন্যে এর চেয়ে বেশি কিছু করতে পারে নি তার জন্যে ক্ষমাপ্রার্থী। এরা ক'জন ভোট দেয়া থেকে বিরত ছিল। অবশ্য সে এইজন্যে নয় যে তাকে নির্দোষ বলে এরা বিশ্বাস করে। বরং বন্ধুত্বের খাতিরে এরা বিরত থেকেছে।

বাইরে একটা লাগোয়া দ্বারপথের ছায়ায় আন্না তার জন্যে অপেক্ষা করছিল। উৎকন্ঠিত, বিপর্যস্তভাবে দাঁড়িয়ে ছিল।

আন্না তার কাছে এলে সে বলল, দুঃখিত। আমি এখন একা থাকতে চাই।

ম্লাগোয়ে এগিয়ে গিয়ে একটা রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগল। এই রাস্তা দিয়ে সে এর আগে না কখনো কাজে এসেছে, না কখনো বাড়ি ফিরেছে। আন্না তার দিকে অশ্রু-ভরা চোখে তাকিয়ে রইল।

রাদোমির আন্দ্রিচ

দেয়ালের আড়ালে

আমরা দু'জনে মিলে লেজ সংগ্রহ করব বলে যখন সিদ্ধান্ত করি তার আগে আমাদের মধ্যে প্রায়ই মারামারি হতো। আর এ-কথাও সত্যি, পরেও আমরা আবার ওই মারামারিই করব, কারণ আমরা একজন আর একজনকে ছেড়ে কোথায় আর যাব। আমাদের বার-বাড়ির চারদিকের উঁচু দেয়ালের আড়ালে আমরা শুকনো পাতা আর খড়ের পালায় লুকিয়ে শুয়ে থাকি, আমার বাবার ভাঁড়ার থেকে চুরিকরা ব্রাণ্ডি যতক্ষণ না শেষ হয়, আমরা পড়ে থাকি। এমনকি আমাদের মধ্যে যখন সুসম্পর্ক নেই তখনও ওই বোতল টানার কোনো না কোনো অজু-হাত আমরা খুঁজে বের করি।

মাঝে-মাঝেই চামড়া, হাড় আর ঘোড়ার চুলের পাইকার আমাদের সঙ্গে পাহাড়ের উপর দেখা করতে আসে। আমার সঙ্গী তখন তার সঙ্গে আমাদের কারবার নিয়ে কথা বলে। আমি তো জুতো কেনার স্বপ্ন দেখি, কিন্তু ও কখনো বলবে না ওই জিনিস দিয়ে আমরা যখন টাকা পাব ও কী কিনবে।

বিভিন্ন সময়ে লোকে আমাদের সামনে "লেজ-চোরদের" সম্পর্কে আলোচনা করে। আমরা তখন পূর্ব-ব্যবস্থিত কোনো সঙ্কেতের জবাব হিসাবেই যেন "সেই শুয়োরদেরকে, তা তারা যেই হোক না কেন" ঘোড়ার ওই সবচেয়ে বড় গৌরব লেজ চুরি করার নিষ্ঠুরতার জন্যে গালাগাল শুরু করি।

তখন আমার সঙ্গী বলবে, আরে, ঘোড়ার যদি কেশর না থাকল, লেজ না থাকল, সে কি আর ঘোড়া! ভাই রে, সে তোমার তখন ওই ঝুঁটি-ছাড়া মোরগ কিংবা, ধরো, ডানা-ছাড়া পাখিরই মতন।

সে যখন বলে, চোর একদিন ধরা পড়বেই, আমি তার সেই ধারণা-টাকে আরো একধাপ এগিয়ে নিয়ে গিয়ে বলি, হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। আমি তোমার সঙ্গে একমত। এর চেয়ে জঘন্য কাজ আর হয় না। আচ্ছা,

ওরা এই কাজ করে কেন? ঘোড়ার চুল কেটে নেয়া, অ্যাঁ? হায় আল্লা, সত্যি এ বড় নোংরা কাজ।

প্রতিবেশীরা যাতে আমাদের সন্দেহ না করে, সে আমার ঘোড়া, আমি তার ঘোড়ার চুল কাটি। আমার বাবার তো একেবারে মাথা খারাপ হওয়ার জোগাড় হয়। তিনি ঈশ্বর, সরকার আর মানবজাতির মুণ্ডপাত করে শেষে আমার মায়ের উপর গায়ের ঝাল ঝাড়তে শুরু করেন। মা আর কী করেন, কাঁধ ঝাঁকি দিয়ে সব মেনে নেন।

তিনি প্রায় দু'মাস ঘোড়া আস্তাবলে লুকিয়ে রেখেছিলেন। তাঁর লজ্জা দিন-রাত তিনি ঘোড়া পাহারা দিলেন, তবু তাঁকে ওই রকম বোকা বানাল।

শুরু যখন করেছি, সমগ্র ঘোড়া-জাতির তাবৎ লেজ কাটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমরা আর ক্ষান্ত দিতাম না। কিন্তু একটা দুর্ঘটনা ঘটে বসে থাকল। আমাদের সবচেয়ে নিকট প্রতিবেশীর এঁড়ে ঘোড়াটির উপর আমাদের নজর পড়েছিল। ও লড়াই দিল। আমার হাত কামড়ে দিল আর আমার সঙ্গীর মুখে চাঁট মারল, তার বাঁ চোখ রক্তবর্ণ হয়ে ফুলে যেন বেরিয়ে পড়বে বলে মনে হলো। ওই চোখে সে দেখতে পায় না। শেষে শহরে ডাক্তারের কাছে গেল, কিন্তু কোনো ফল হলো না। সে এক-চোখ-কানা হয়ে গেল। ফিরে এলে তাকে আমি বহু দিন পর্যন্ত এড়িয়ে চললাম। তার বাঁ চোখের দিকে তাকালেই আমার আতঙ্ক হতো। মনে হতো, সে আমার ভেতরের সবকিছু, আমার আত্মার একেবারে তল পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে, বরং তার চেয়েও বেশি দেখতে পাচ্ছে, যেখানে আমার আর কিছুই নেই, রয়েছে কেবল শূন্য, সেই পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে। একদিন সে আমার কাছে এল। বলল, এই যে, কিছু রাকিয়া এনেছি। চলো, দেয়ালের আড়ালে যাই।

এড়িয়ে যাওয়ার আর উপায় ছিল না। দেয়ালের আড়ালে গেলাম। উন্মত্তের মতো কয়েক চুমুক টানার পর সে একপাশে মাথা হেলিয়ে আমার দিকে তাকাল। বলল, লেজগুলো কোথায়?

বললাম, এই তো, এখানে রয়েছে।

বলতে বলতে মনে হলো আমার গলায় কিছু আটকে যাচ্ছে। ও বলল, ঘোড়ার চুলের পাইকার কাল আসছে।

লোকটা লম্বা, পাৎলা। ঘন গোঁফ, সামান্য প্যাঁচানো, ঘন-ঘন সে ওই গোঁফ মোচড়ায়। বস্তা-ভর্তি চুল যখন সে দেখল, মুখে আনন্দের আলো খেলে গেল। বলল, চিন্তা কোরো না, আমি কাউকে বলব না। কাল বা পরশু আমি তোমাদের টাকাটা দেব। এই মুহূর্তে আমার কাছে নেই।

তোমার কাছে নেই? তার মানে?

আমার কাছে এখন নেই, এই আর কী।

বলে' সে বস্তাটা তুলে নিল।

দশ পাও যায় নি আমাদের হুঁশ হলো।

ও আমাদের কিছুই দেবে না, তাই না?

হ্যাঁ, কিছুই দেবে না।

আমি চিৎকার করে উঠলাম, এই, থামো।

পাইকার আমাদের দিকে সামান্য মুখ ফিরিয়ে দেঁতো হাসি হাসল। বলল, আমি কিন্তু রিপোর্ট করতে পারি। যদি করি ··

আমরা সামান্য চিন্তা করে বললাম, যদি করো, কী হবে?

আমরা ত্বরিত ওকে কাবু করে ফেললাম, পেছন থেকে ওর উপর লাফিয়ে পড়েছিলাম। বস্তা একদিকে গড়িয়ে গেল, ও পড়ে গেল। আমরা ওকে মারলাম, শরীরের সবখানে পিটি দিলাম। নিজেকে বাঁচাতেও পারল না, চেঁচাতেও পারল না। মারের চোটে ও গোঙাতে লাগল। তখন ওকে ছেড়ে দিলাম।

এখন?

এখন আর কী। বস্তাটা নিয়ে নাও। ওটা আমাদের।

কিন্তু ও বেটা রয়েছে না?

ও কী করবে? ওর শিক্ষা হয়ে গেছে।

মরে যাবে না তো?

না, মরবে না। ওকে একটু ব্রাণ্ডি দাও।

ওর মাথা একটু তুলে ওর মুখে ব্রাণ্ডি ঢেলে দিলাম। ও অনেকটা স্বাভাবিকভাবে দম নিতে লাগল, চোখ তুলে তাকাল। ও এখন আর

আমার দিকে তাকাচ্ছে না, বরং আমাকে ছাড়িয়ে বস্তাটা যেখানে পড়ে রয়েছে সেইদিকে তাকিয়ে রয়েছে। আমার একচোখ-কানা বন্ধু ওটার উপর ঝুঁকে পড়ে দেয়াশলাইয়ের কাঠি ঠুকছে।

'না না!' বলে পাইকার উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল কিন্তু পারল না। একটা নীল শিখা জ্বলে উঠল। দেখে মনে হলো যেন একটা রাগান্বিত ঘোড়া তার পেছন তুলে তুলে পা ঠুকছে এবং চারদিকে ঘুরে ঘুরে লেজ দোলাচ্ছে। ওই প্রজ্জ্বলিত অশ্ব-শিখা যেন আমাদের তিনজনের মুখের উপরেই এক এক করে কশাঘাত করছিল। আমাদের উপর দিয়ে যন্ত্রণার ঢেউ খেলে যাচ্ছিল, আমরা অন্ধ হয়ে যাচ্ছিলাম।

আমি বিড়্ বিড়্ করে বলে উঠলাম, আমার জুতো. যাহ্, আমার জুতো পুড়ে শেষ হয়ে গেল।

আমার সমস্ত শরীর দিয়ে একটা মৃদু শিহরণ বয়ে গেল।

লয়্ বোমির · তেশিচ

তালাক

…মা আর বাবা ফ্ল্যাটটাকে ভাগ করে নিলেন। আমাদের মাঝখানে আছে মাত্র প্যাসেজখানা। আমরা বাম দিকে, ওঁরা ডানদিকে। ওঁরা মানে আমার বাবা আর নোভি সাদ-এর আন্টি জুলি। আমাদের ঘরগুলো রাস্তার দিকে, ওঁদেরগুলো বাগানের দিকে। আমার মা, আমার ভাই আর আমি থাকি আমাদের ঘরে। আমাদের আর আছে রান্নাঘর আর ভাঁড়ার ঘর। ওঁদের সঙ্গে আমাদের দেখা যদি আদৌ কখনো হয় সে ওই করিডরে। যেই ওঁদের দরজার ক্যাঁচ্ শব্দ শুনি, আমরা লুকিয়ে পড়ি, এবং ওঁরা যতক্ষণ না গেছেন একেবারে দম বন্ধ করে থাকি। আন্টি জুলিকে আমার ভালো লাগে না। আমার ভাইও ওঁকে পছন্দ করে না। বাবা বলেন, "ইনি তোমাদের আর এক মা", তবু আমরা ওঁকে পছন্দ করি না। কারণ আমাদের মা তো আছেনই। আন্টি জুলির চুল সাদা, আর যখন তিনি হাসেন, তাঁর সব কয়টি দাঁত দেখা যায়। মা-ও আন্টি জুলিকে দেখতে পারেন না। আমি আমার ভাইকে বলি, "তোমার দুটো মা থাকতে পারে না।" সে বলে, "মা তোমার একটাই থাকতে পারে।"

আন্টি জুলি আমাদের দেখলে হাসেন। তিনি হাত বাড়ান, আমাদের মাথায় হাত রাখতে চান। বলেন, "আহা, আমার সোনামণিরা।" কিন্তু আমরা মাথা ঘুরিয়ে নিয়ে দৌড় দিই। তখন তিনি তাঁর ঘরে আমাদের ডাকেন, কিন্তু তবু আমরা দৌড়ে পালাই। আমাদের মা বলেন, "শোনো বাছারা, ওই মেয়েলোকটাকে তোমরা ঘৃণা করবে। এই বাড়িটাকে ও নরক করে তুলেছে।" আমরা মায়ের কথা মান্য করে ওঁকে ঘৃণা করি। আন্টি জুলি মায়ের সঙ্গে কথা বলেন না। তাঁরা করিডরে যাতে দেখা হয়ে না যায় তার চেষ্টা করেন। মাঝে মাঝে তাঁরা কলহ বাধিয়ে দেন। তখন আমাদের মা বলেন, "এই যে, তুই, নোভি সাদের মাগী, তুই ওই বুড়ো ভেড়ার মাথা খেয়েছিস।" তখন আন্টি জুলি বলেন, "এই যে মেয়ে, তুমি কী বলছ নিজেই একটু

ভেবে দেখো'। হ্যাঁ, তোমার কপালে হাজত আছে এই বলে দিলাম, ধুম্‌সী বুড়ি।" আর তখন দু'জনে পাল্লা দিয়ে গলা চড়াতে লেগে যান। এই হচ্ছে প্রথম লক্ষণ, ওঁরা এবার একে অপরের চুল ছিঁড়বেন। তখন ওঁরা চিৎকার শুরু করে দেন, আর আমরা ছুটে যাই আমাদের মা-কে সাহায্য করতে। আন্টি জুলির বয়েস কম, তাঁর গাঁয়ে জোর বেশি। আর আমার ভাই বলে, ওঁর মুখটা হচ্ছে ঘোড়ার মতো। আমি আন্টি জুলির স্কার্ট ধরে টানি আর চিৎকার করি। আর আমার ভাই ওঁর উপর লাফিয়ে পড়ে' ওঁর হাতে পায়ে কামড় বসায়। তখন ওঁরা একে অপরকে ছেড়ে দেন, গলা ফাটিয়ে কাঁদেন, মুখে ওঁদের ফেনা ওঠে। আমার মায়ের সারা গায়ে আঁচড়, আন্টি জুলিরও তাই। আমরা আমাদের ঘরে ঢুকে দরজা দিই, আন্টি জুলি তাঁর ঘরে ঢুকে দরজা দেন। প্যাসেজ খালি পড়ে থাকে। মা অনেকক্ষণ ধরে বিলাপ করেন, "বাড়িটা জাহান্নম হয়ে গেল, বাড়িটা জাহান্নম হয়ে গেল।" সকালের দিকে এই সব কাণ্ড ঘটে, বাবা তখন তাঁর কাজে বাইরে থাকেন।

তখন মা আমাদের বলেন, "এই হারামজাদী যদি তোদের কিছু খেতে দেয়, কক্ষনো খাবি না, ও তোদের বিষ দিতে পারে, বুঝলি?" সুতরাং আমরা ওঁকে আরো বেশি এড়িয়ে চলি। আমাদের মিন্টি বা কমলা-লেবু দিতে এলে মুখ ঘুরিয়ে নিই। আমার বাবার কাছ থেকেও মুখ ঘুরিয়ে নিই, কারণ আন্টি জুলি যে তাঁর মাথা চিবিয়ে খেয়ে ফেলেছেন। মা বলেন, "ওই বুড়োর ভীমরতি ধরেছে।" কখনো কখনো তিনি প্যাসেজে দাঁড়িয়ে বিলাপ করেনঃ "তোমার মধ্যে ও কী পেয়েছে!" আর তখন বাবা মায়ের কাটা ঘায়ে আরো নুনের ছিটে দেয়ার জন্যে আন্টি জুলিকে নিয়ে বেরিয়ে আসেন এবং তাঁকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়ে থাকেন। দরজায় দাঁড়িয়ে বলেন, "এই কুত্তী, ঘরে যা। যা, গিয়ে নিজের চুল নিজে ছেঁড়্ গিয়ে।' বলে' আন্টি জুলির কাঁধে চুমু খান। তখন ওঁরা বেরিয়ে "মোটেলে" যান বা "গ্র্যাণ্ডে" যান, গিয়ে গান শোনেন। এক রাত্রে আমার মা আর আমি চুপি-চুপি ওঁদের পিছু-পিছু গিয়েছিলাম। কাচের ভেতর দিয়ে ওঁদের দেখেছিলাম। মা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে অবরুদ্ধ গলায় কেঁদেছিলেন।

আমি প্রবোধ দেয়ার চেষ্টা করেছিলাম। আর তখন আমিও একটু কেঁদেছিলাম।

যখন, ওঁরা বাইরে কোথাও যান আমরা দরজার শব্দ আর আন্টি জুলির হাই-হিলের পরিষ্কার শব্দ শুনতে পাই। আমরা জানালায় ছুটে গিয়ে পর্দার আড়াল থেকে উঁকি মারি। ওঁরা রাস্তায় গিয়ে নামলে মা চিৎকার করে বলেন, "এই যে, তুই মাগী ওই বুড়োকে ভেড়া বানিয়েছিস। কোন্ কুক্ষণে সেবার তোর সঙ্গে নোভি সাদে দেখা হলো, সেই তখন থেকে ওর মাথায় ভূত চেপেছে।" তখন আমার ভাই মা-কে জিজ্ঞেস করে, "বাবার মাথায় কেমন ভূত চেপেছে, মা?" মা বলেন, "বড় হলে তখন তুমি ওই সব বুঝতে পারবে। এখন তোমার বয়েস হয় নি।" আমি তখন মা-কে জিজ্ঞেস করি বাবার মাথা থেকে ওই ভূতটাকে তাড়ানো যায় কিনা? তিনি বলেন, "সময় হলেই ওই ভূত নামবে।" বলে' জানালায় মুখ রেখে গলা যতদূর পারা যায় চড়িয়ে আর্তনাদ করেন: "ওরে ও মাগী! আর ও বুড়ো ভেড়া পাভ্লে!" কিন্তু ওঁরা তার কিছুই শুনতে পান না, ততক্ষণে ওঁরা অনেকদূর চলে গেছেন এবং দেখতে দেখতে রাস্তায় মোড় নেয়াও হয়ে গেছে।

তখন আমরা আবার যার-যার জায়গায় চলে যাই। মা রন্নাঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দেন। আমরা জানি উনি ওখানে কী করছেন। কাঁদছেন। উনি কাঁদলে আমাদের ভালো লাগে না। তাই দরজায় গিয়ে শব্দ করি। উনি দরজা খুলে চোখ মোছেন। তখন আমাদেরও কান্না এসে যায়। প্রথমে আমি কাঁদতে শুরু করি, তারপর আমার ভাই। সুতরাং আমরা সবাই রান্নাঘরের কৌচে গুন্‌গুনিয়ে কাঁদতে বসে যাই। শেষে মা বলেন, "কেঁদে কী হবে।" বলে, আস্তে-আস্তে কান্না থামান। তিনি থামলে আমরাও থামি।

আসলে কিন্তু বাবা চাইতেন আমাকে তাঁর পক্ষে টানতে, কিন্তু আমি তাতে রাজি হই নি। তখন আমার ভাইকে তিনি বোঝাতে শুরু করেন। কিন্তু সেও রাজি হয় না। আমরা বলি, বাবা আর আন্টি জুলির চেয়ে আমরা বরং মায়ের সঙ্গে থাকব। "আমরা তোমাদের

ঘেন্না করি' এই কথা বলে আমরা দৌড়ে পালাতাম। আন্টি জুলি বলতেন, "ওই কুত্তী ওদের মন বিষেয়ে দিয়েছে।"

কলহ শুরু হলো যে রাত্রে বাবা আন্টি জুলিকে নোভি সাদ থেকে এনে ঘরে তুললেন। তার আগে মারাত্মক ঝগড়া কখনো হয় নি, কারণ তখন পর্যন্ত বাবা আন্টি জুলির কাছে যেতেন নোভি সাদে। তিনি যখন ওঁকে আনলেন, মা বললেন, "পাভ্‌লে, তুমি কি মনে করো তোমার এ-কাজ করা চলে? আমার লাশের উপরে!" তখন তাঁরা করিডরে একে অপরের গলা টিপে ধরাধরি শুরু করলেন, আমরা চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করলাম। যখনি ওঁরা ঝগড়া শুরু করেন আর গলা টিপে ধরাধরি করেন আমরা সব সময় ভয়ানক চিৎকার জুড়ে দিই। আমরা মারাত্মক ভয় পাই। সে রাত্রে ওঁরা অনেকক্ষণ পর্যন্ত ঝগড়া করলেন। তারপর যার-যার এদিকে ওদিকে ভাগ হয়ে যাওয়ার জন্যে করিডরে যত জিনিসপত্র দিয়ে বাধা তৈরি করা হলো। সে রাত্রে আমি আর আমার ভাই ঘুমাতে পারি নি। মায়েরও ঘুম হয় নি। পরদিন আমি স্কুলে যেতে পারি নি। আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি, জ্বর উঠে যায়। তখন পর্যন্ত আন্টি জুলি আমাদের দিকে হাসি-মুখে তাকাতেন। তিনি সদর দরজায় মুখ বের করে আমাদের দেখতেন। আমরা দৌড়ে পালাতাম। মা বলতেন, "তুই বেশ্যা এই বাড়িটাকে নরক করে তুলেছিস।" আন্টি জুলি বলতেন, "মুখ সামলে কথা বলো, মেয়ে!" মা চিৎকার করে বলতেন, "বাছারা, ওই যে ওর দিকে একটু তাকিয়ে দেখো। ওই মেয়ে, ওই আবর্জনা তোমাদের বাবার মাথা চিবিয়ে খেয়েছে।"

তখন থেকে আমরা রাস্তার দিকের ঘরগুলো নিয়ে আছি, ওঁরা আঙিনা আর বাগানের দিকের ঘরগুলোতে আছেন। যখনই শুনি ওঁদের দরজা খুলছে, আমাদের দরজা বন্ধ আছে কিনা ভালো করে দেখে নিই। যখন আর কোনো উপায় থাকে না কেবল তখনই ওঁদের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়ে যায়। ওঁরাও আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে চলেন। যে জিনিসটাকে আমি সবচেয়ে ভয় করি সে হচ্ছে মারামারি আর ওই গলা টিপে ধরাধরি। সেইজন্যে আমি সব সময়

ভয়ঙ্কর সতর্ক থাকি। যখন ওঁরা একে অপরের উপর ঝাঁপিয়ে না পড়ে থাকতে পারেন না, মা হয়তো বলেন "তুই মাগী এই বাড়িটাকে নরক করে তুলেছিস!" তখন একে অপরের দিকে এগিয়ে যান। আন্টি জুলি বলেন, "মুখ সামলে কথা বলো, মেয়ে, না হলে তোমার থোঁতা মুখ আমি ভোঁতা করে দেব।" আর মা লাফিয়ে গিয়ে চিৎকার করে বলেন, "বাড়িটাকে নরক করে তুলল, নরক করে ছাড়ল!" এবং একে অপরের চুলের গোছা ধরে সারা বাড়িময় টানা-হ্যাঁচড়া শুরু করে দেন। তখন আমার ভাই আর আমি তীর-বেগে ছুটে গিয়ে মা-কে সাহায্য করতে লেগে যাই। আমি আন্টি জুলির স্কার্ট ধরে টানি, আর আমার ভাই তাঁর হাতে-পায়ে কামড় বসায়।

এই কাণ্ড প্রায় ঘটে। আর মা আমাদের বলেন, "বাছারা, ওকে যত পারিস ঘৃণা করিস। বাচ্চাদের ঘৃণার চেয়ে মারাত্মক জিনিস আর নেই।"

আর আমরা করিডরে গিয়ে ওঁদের দরজার চাবির ছিদ্র দিয়ে চিৎকার করে বলি, "এই যে নোংরা আবর্জনা! আমরা তোমাদের ঘেন্না করি।' মা বলেন, "হ্যাঁ, আমাদের আর কিছুই করার নেই ওই ঘেন্না করা ছাড়া।" তখন বাবা তাঁর ঘর থেকে ভয় দেখান, চেঁচিয়ে বলেন, "এই নরকে আমিও আর থাকছি না, হ্যাঁ।"

একদিন একটা লোক এল। সে মায়ের সমন এনেছে। মা তাতে সই দিয়ে বললেন, "এই যে দেখো, এটা আদালতে হাজির হওয়ার সমন।" এবং আমরা আরো ভয় পেয়ে গেলাম, কারণ মা কাঁদছেন। আমার ভাই আর আমিও সঙ্গে সঙ্গে গুন্-গুন্ করতে শুরু করেছি। আদালতকে আমি ভয় করি। ওই শব্দটা শুনলেই আমার মনে হয় ভয়ঙ্কর কিছু ঘটেছে, এবং নিশ্চয় কাউকে জেলে কিংবা শ্রম-শিবিরে যেতে হবে। আমার ভাই বলে, সেও ভয় পেয়েছে। আমি তাকে বলি, "তোমার ভয় পাওয়া উচিত নয়, তুমি না পুরুষ-মানুষ?" সে বলে, "পুরুষমানুষ তো কী হয়েছে? আমরা ভীতুও বটে।" আমাদের শিক্ষক বলেন, মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে বেশি ভীতু।

আমি আমার ভাইকে বলি, "আদালতের কথা শুনলেই সঙ্গে-সঙ্গে আমার পেটে কেমন ব্যথা শুরু হয়, পায়খানা হয় ,আর খালি পেচ্ছাব পায়।"

কয়েক দিন পর মা আর আমি আদালতে গেলাম। আসলে মা আমাকে নিয়ে যেতে চান নি, কিন্তু আমি কেঁদে-কেঁদে সারা হয়ে গেলাম, অনুনয় করলাম, তখন তাঁর দয়া হলো। বললেন, "তুমিও কেন কষ্ট পেতে যাবে?" বলে' আমাকে কাপড় পরাতে লাগলেন। আমার চুলে রিবন বেঁধে দিলেন। তারপর রওনা হলাম। তাঁর স্কার্ট শক্ত করে ধরে থাকলাম। আমার ভাইও যেতে চেয়েছিল। আমরা কোনো রকমে তাকে ঠেকালাম। ও মাদুরে গিয়ে শুয়ে পড়ে পা ছুঁড়তে লাগল, কাঁদতে লাগল, বলতে লাগল, "আমিও আদালতে যাব, আমিও আদালতে যাব।" কিন্তু কাউকে তো ঘরে থাকতে হবে। আমরা ওর জন্যে খেলনা আর মিষ্টি আনব বলে কথা দিলাম। শেষে আমরা যাত্রা করলাম। দেখলাম, ও কাচে মুখ চেপে ধরে জানালা দিয়ে তাকিয়ে রয়েছে, কেঁদে-কেঁদে চোখ-দুটি লাল হয়েছে।

আদালতটা ভয়ানক বড়। ওটার দিকে তাকাতে গিয়ে আমার দম বন্ধ হয়ে আসতে চাইল। মা বললেন, "অস্ট্রিয়ার সম্রাট এই বিল্ডিং বানিয়েছেন।' এই দিকটায় আমি এসেছি খুব কম, আর আদালত যা দেখেছি দূর থেকে। ভেতরে অসংখ্য করিডর, সবখানে মানুষ। আমরা একগাদা সিঁড়ি ভেঙে উপরে গেলাম, আবার আর একগাদা সিঁড়ি ভেঙে আরো উপরে গেলাম। মা-কে জিজ্ঞেস করলাম, "এই যে সব মানুষ, এদের সবার তালাক হচ্ছে?" মা বললেন, "আল্লা জানেন।" দরজার বাইরে বাইরে সব গাদা-গাদা নারী-পুরুষ দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমাদের সমনে লেখা আছে, "প্রধান শুনানি হবে দশটায় ৭২ নং কক্ষে।" আমরা ৭২ নং কক্ষ খুঁজতে লাগলাম। আমি মায়ের হাত শক্ত করে ধরে ছিলাম, কিছুতে ছাড়ছিলাম না। মা-কে হারিয়ে ফেলব কেবল এই ভয় হচ্ছিল। আমাকে যদি কখনো একা আদালতে আসতে হয় এই ভয়ে আমি মরে যাচ্ছিলাম। আমিই প্রথম দেখলাম বাবা আর আন্টি জুলিকে, এক দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

ওটাই নিশ্চয় ৭২ নং কক্ষ। আন্টি জুলি বাবার বাহু আঁকড়ে ধরে আছেন। আমরা ওঁদের কাছাকাছি যেতে চাইছিলাম না। হয়তো আবার লড়াই লেগে যাবে। তখন কালো স্যুট-পরা একটা মানুষ বেরিয়ে এল, মা আর বাবাকে কক্ষের ভেতরে ডাকল। আমরা কিছুই বলি নি। ওরা মায়ের আর বাবার আবার ভাব করিয়ে দেয়ার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু বাবা এমনকি সে-কথা শুনতে পর্যন্ত রাজি নন।

মা কাঁদতে-কাঁদতে বললেন, "ওই বেশ্যা ওর মাথা চিবিয়ে খেয়েছে।" আর আন্টি জুলি বললেন, "মুখ সামলে কথা বলো মেয়ে। তুমি জানো না কোথায় কী বলছ। কুৎসার দায়ে আমি তোমাকে কাঠগড়ায় তুলতে পারি।"

তারপর ওঁরা লড়াই শুরু করে দিলেন। প্রথমে বাবা চিৎকার শুরু করলেন, তারপর মা।

বিচারক তাঁর ছোট হাতুড়ি পিটিয়ে উচ্চকণ্ঠে বললেন, "চুপ করুন, আপনারা চুপ করুন! কী পেয়েছেন কী? এটা আদলত-কক্ষ, না মাছের বাজার?" লাল পোশাক-পরা এক মহিলা এই সবই টাইপ-রাইটারে লিখে নিলেন।

বাবা বিচারকের কথার জবাব দিচ্ছেলেন। তিনি বললেন, "আমি যতদিন অন্ধ ছিলাম আর যতদিন আমি জানতাম না জীবন কী, জীবন কেন, তত দিন পর্যন্ত ওই মেয়েলোক আমার পক্ষে ঠিক ছিল। কিন্তু আমার চোখ যখন খুলে গেল, আমি বুঝতে পারলাম, যদি ওর সঙ্গে থাকি, আমি পচে নষ্ট হয়ে যাব।"

আর মা আবার কাঁদতে লাগলেন, সবার সামনে। তখন তিনি লজ্জায় সঙ্কোচে একেবারে লাল হয়ে গেলেন। তখন তিনি কথা বলতে লাগলেন। এবং কী হচ্ছে আমি আর কিছু বুঝতে পারছিলাম না। আমি বেরিয়ে গিয়ে করিডরে দাঁড়ালাম, কারণ আমার সারা গায়ে ঘাম ঝরছে। ওই কক্ষে খুব গরম। আর আমার পেচ্ছাব পেয়েছিল। ঠিক দরজার বাইরে করিডরে আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। একটা লোক বলল, "আহা, বেচারা ছোট মেয়েটাকে দেখো তো। ঠিক আমার ছোট

মেয়ের মতো!” তখন আমার আরো খারাপ লাগতে লাগল, আমি কান্নায় ভেঙে পড়লাম। আমার পেচ্ছাব পেয়েছিল, কিন্তু আমাকে নিয়ে যাওয়ার কেউ নেই। আমি প্যান্টেই করে ফেললাম। আমি জানি না ভেতরে কী হচ্ছে। মায়ের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলাম, তিনি এলেই বাড়ি চলে যাব। শেষে মা বেরিয়ে এলেন এবং আমরা বৃহৎ করিডর ধরে একদিকে হাঁটতে লাগলাম এবং বাবা ও আন্টি জুলি বেরিয়ে অন্য দিকে চলে গেলেন। আমরা রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগলাম, মা আপন মনে কেঁদেই চললেন। মায়ের দু-একজন বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে যাচ্ছিল। তাঁরা জিজ্ঞেস করছিলেন, কী হয়েছে। মা বলছিলেন, তাঁর দাঁত-ব্যথা। তারপর আমরা বড় রাস্তা ছেড়ে গলি ধরলাম। মায়ের স্কার্ট শক্ত করে ধরে থাকলাম।

তারপর আমরা বাড়ি ভাগ করে নিলাম, আসবাবপত্র এবং যা কিছু ছিল ভাগ করে নিলাম। আমাকে আর আমার ভাইকে আদালত বাবাকে আর আন্টি জুলিকে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু ওঁদের কাছে থেকে মানুষ হতে আমরা রাজি হই নি।

আমাদের শিক্ষক আমাকে প্রায় জিজ্ঞেস করেন, “এই যে মণি বিলুয়ানা, তোমাকে এমন অসুখী দেখায় কেন বলো তো?” কিন্তু আমি তাঁকে বলতে চাই না। আমি কাউকে কিছু বলতে চাই না। আমার মায়ের এই নিয়ে খুব লজ্জা। আমারও খুব লজ্জা। আমি কেবল ডেস্কে বসে থাকি, কিছু বলি না। আমি তাঁকে বলতে চাই না যে আমার মা আছেন, কিন্তু এক ডাইনী আমার বাবার মাথা খেয়েছে। অন্য ছেলেমেয়েরা আমাকে নিয়ে তামাশা করে, আমাকে দেখে' হাসে। কখনো কখনো আমি মাঠের প্রান্তে গিয়ে লুকিয়ে থাকি, না হয় টয়লেটে গিয়ে খিল এঁটে দিয়ে একটু কাঁদি। যখন ক্লাস শুরু হওয়ার ঘন্টা পড়ে, আমি আমার স্কার্টে চোখ মুছি, মাঠের উপর দিয়ে দৌড়ে যাই এবং ভাব দেখাই আমার কিছুই হয় নি। আমার ভাইও ভাব দেখায় তার কিছুই হয় নি।

স্লাভিচা চোলাক

পার্ক

আমাদের এই রাস্তার সকল মা ছোট পার্কটিকে ভালোবাসেন। কারণ, পার্কটি রয়েছে বলে আমাদেরকে কোথায় রাখা যায় তাই নিয়ে তাঁদের চিন্তা করতে হয় না। সেই যে সেই লাল-মুখ-ওয়ালা কবি যিনি গত বছর পর্যন্ত আমাদের এখানে ছিলেন (ওই বছর আমার বোন বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়ে আবার বাড়ি ফিরে এল কিনা), সেই কবি বিষণ্ণ নিরানন্দ কংক্রিটের সব স্তূপের মাঝখানে এই সবুজ জমিটুকু দেখলেই ভারি আনন্দে চুলবুল করে উঠতেন। ওই কবির কাজ ছিল সর্বদা যত আবোল-তাবোল বকা। ২ নম্বরের ঘোড়া-নেকো দ্রাগিচার চাচা একবার বলেছিলেন, "ঘাসের ওই যে একটুখানি জমি, এবং সমগ্র এলাকায় ওই যে মাত্র ওইটুকু ঘাস, ওর থেকে এই প্রমাণ হয় যে সভ্যতার সঙ্গে লড়াইয়ে প্রকৃতি হেরে গেছে।" (দ্রাগিচা বলে, তার ওই চাচা দুঃখবাদী। কিন্তু আমার মনে হয়, ওঁর মাথায় একটু গোলমাল রয়েছে। আমরা যখন খেলি, হয়তো একঘন্টা ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মুখে রাজ্যের করুণা আর সন্তাপ নিয়ে আমাদেরকে দেখছেন, মাথাটি একদিকে হেলে রয়েছে, এবং ফিশ্ ফিশ্ করে নিজের সঙ্গেই বিচিত্র সব সংলাপ চালাচ্ছেন, এবং যদি কখনো উঁচু গলায়ও কিছু বলে ওঠেন, কী যে বলছেন কেউ কিছু বুঝতে পারছে না।) আমার মনে হয় বড়রা সবাই ছোট পার্কটি সম্পর্কে যা ভাবার ওই রকমই ভাবেন। বড়রা কখনো জরুরী বিষয় বা সুন্দর জিনিস নিয়ে মাথা ঘামান না। আমার তো মনে হয় না আমি নিজে ওঁদের মতো বড় হতে চাই।

পার্কটি ছাড়া আমাদের আর যা রয়েছে, ৬ নম্বরের প্রবেশ-মুখের উপরে ওই মাত্র একটি পুরনো ভাঙা পথের বাতি, আর রয়েছে একটি সেলার, ভূগর্ভঘর, যার ভেতরে বাইরে থেকে আপনি ঢুকতে পারেন। অতএব সহজেই কল্পনা করা যায় আমাদের চওড়া ঢালু বৃক্ষহীন এই রাস্তায় কতকগুলো চেস্টনাটগাছের বড়-বড় ডালের ছায়ায় ওই সামান্য ঘাসের জমিটুকু আমাদের কাছে কী। এই রাস্তার গায়ে না কোনো

বেড়া আছে, না খোলা মাটি আছে, সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত কেবল ট্রাম চলে ঘড়্ ঘড়্ করে, উল্লেখযোগ্য জিনিস বলতে আছে কেবল ওই একটি পুরনো পথের বাতি আর ওই একটি ভূগর্ভ-ঘর। অন্য রাস্তায় গিয়ে খেলার অনুমতি আমাদের নেই, এবং আমাদের রাস্তায়ও বাইরের কাউকে এসে খেলতে আমরা দিই না। এই নিয়মের ব্যতিক্রম অবশ্য আছে। কিন্তু আমাদের এই রাজ্যের সার্বভৌমত্বের সম্মানের অংশী যে হতে চাইবে তাকে বিভিন্ন পরীক্ষায় উৎরাতে হবে, এবং নানা রকম শপথ নিতে হবে। আমাদের মাথায় যখন যে খেলা আসে তখন তাই খেলি। ধরুন, আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় দৌড়বিদ্ কে তাই দেখার ইচ্ছা হলো, ছোট পার্কটির চারপাশেই আমরা দৌড় লাগালাম। আমাদের মধ্যে সবচেয়ে চালাক কে তাই দেখার জন্যেও ওই পার্কেই আমরা একে অপরকে বুদ্ধির খেলায় হারাতে লেগে যাই। আমরা মারামারি করি, গড়াগড়ি খাই, হাসি, গাই, বাহাদুরি করি, বসন্তের সময় ধুরায় বল-বেয়ারিং লাগিয়ে ছোট ছোট গাড়ি বানাই, শীতে আমাদের স্লেজের রানার যত্ন করে সমান করি। ছোট মেয়েরা দল বেঁধে ঘাসে শুয়ে-শুয়ে কিচির-মিচির করে, খি-খি করে হাসে, হাঁড়ি-পাতিল খেলে, পুতুল খেলে, পুতুলের তাদের অসুখ হয়, বিয়ে হয়। ওদের এই সব গাধামির কথা বাদ দিলে, ওরা অবশ্য তেমন খরাপ নয়। ওরা আমাদের কেক, ফল এই সব এনে খাওয়ায়, বিনিময়ে আমরা ওদের আমাদের গাড়িতে চড়াই, টোবোগ্যানে চড়াই। সকালে নাশতার পরেই আমরা বাসা থেকে বেরিয়ে পড়ি, ফিরি সেই রাত করে। কিছু কিনতে যাওয়ার দরকার পড়েছে, আমাদের মা-রা জানালা দিয়ে আমাদের ডাকেন, লম্বা দড়ি-বাঁধা ছোট ঝুড়িতে করে পয়সা নামিয়ে দেন। ওঁদের প্রত্যেকের ওই রকম একটি করে ঝুড়ি বা ওই রকমের কিছু রয়েছে। আর তখন চলবে কথা-কাটাকাটি, যুক্তি-তর্ক। কে যাব কার সঙ্গে। শেষে সবাই দৌড় লাগাব দোকানের দিকে। কিন্তু ফিরে আসব আস্তে আস্তে। চিনির মধ্যে আঙুল ডোবাব, রুটি খুঁটে-খুঁটে খাব, দু'পা ফেলে আবার থামব। এই কারণে জরুরি কেনাকাটা যদি থাকে, মা-রা নিজেরাই করেন। লাঞ্চের সময় অবশ্য আমরা বাসায় আসি, কিন্তু সেও বহু ডাকাডাকির পরে। মা-রা ডাকবেন, আমরা শুনতে না পাওয়ার

ভাণ করব, গাছের নিচে লুকিয়ে থাকব। তারপর তাঁদের চিৎকার শুনে-শুনে যখন হদ্দ হয়ে যাব তখন যাব। এ হচ্ছে আমরা যখন খুব ছোট্ট ছিলাম তখনকার কথা। এরপর আমাদের স্কুলে দেয়া হয়। আমরা স্কুলে যাই ওই পার্ক থেকে, আর স্কুল থেকে ওখানেই ফিরি। ওইখানে বসে আমরা একজন আর একজনের খাতা থেকে বাড়ির কাজ টুকে নিই, আর কে কাকে ভালোবাসে তার শেষ সংবাদ আর গাল-গল্প পরস্পর চালান করি। আমরা কখনো সময়ের হিসাব করি না। এবং আজ আর আমি বলতে পারব না, ওই সব বাল্য-লীলা কতকাল চলেছিল। এখন সেই সব দিনের কথা যখন ভাবি, মনে হয়, একটা দীর্ঘ ধারাবাহিক খেলাই যেন আমরা খেলেছিলাম।

তারপর, এই গত বছরের কথা। একদিন সকালবেলা স্কুলে যাওয়ার আগে আমরা সবাই একজায়গায় জড় হয়ে এক ছোঁড়াকে র‍্যাস্পবেরির ফল ছুঁড়ে-ছুঁড়ে মারছি, ওই ছোঁড়া অন্য পাড়া থেকে এসে বাজি ধরে সবচেয়ে উঁচু চেস্টনাট-গাছটাতে উঠেছিল, তারপর আর নামতে পারছে না, একটা ট্রাক আর কিছু যন্ত্রপাতি রাস্তায় এসে পার্কের সামনে দাঁড়াল। ট্রাকের ড্রাইভার, ছোট কুঁজো মানুষটি, আমাদের কাছে এল, বলল, এই যে ছেলেরা, যাও যাও, এখানে আর নয়, অন্য কোথাও গিয়ে হল্লা করো-গে যাও। অন্যেরা সব কোদাল বেল্‌চা নিল। পার্কটাকে ওরা এদিক থেকে ওদিক, ওদিক থেকে এদিক কোনাকুনি মাপল, তারপর খুঁড়তে লেগে গেল। ওরা কয়েক দিন ধরে কাজ করল। আমরা এখানে ওখানে বসে গুলতানি মারলাম, মুখের ভেতর থেকে টেনে-টেনে চুয়িং গাম বের করতে করতে ওদের যন্ত্রের মোটরগুলোকে আড় চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলাম। কাজের লোকগুলো আমাদের কিছু বলল না, চারদিকে ঘুর-ঘুর করে বেড়ানোতেও আপত্তি করল না। মধ্যিখানে ওরা খুব বড় একটা গর্ত করল, কয়েকটা নালা খুঁড়ল, চারদিকে মাটির স্তূপ করে রাখল, তারপর চলে গেল। পার্কটা সমস্ত হেমন্ত আর শীত ওই রকম খোঁড়া পড়ে রইল।

সুতরাং আমাদের একটা নতুন যুদ্ধক্ষেত্র হলো, লুকোচুরি খেলার নতুন জায়গা পাওয়া গেল। ওই শীতে আমরা অসংখ্য সুড়ঙ্গ আর ফাঁদ খুঁড়লাম। পথচারীদের উপর আমাদের যুদ্ধের কৌশল প্রয়োগ

করে বা তাদের উপর ব্রাশ চালিয়ে অমনি আমরা আবার বড় গর্তটায় গিয়ে জড় হই, সভা করি এবং সামরিক ক্রিয়াকল্প নিয়ে আলোচনা করি। আমরা এন্তার খেললাম, খুব উপভোগ করা গেল, খুব মজা হলো। মজা হবে না কেন! ধরুন, আপনার জমিতে যদি অন্যের সমাধি রচিত হয়, সেটা একটা কাণ্ড বই কি! কিন্তু, তারপর কী হলো। যেই শীত গিয়ে বসন্ত এল, কাজের লোকগুলো আবার এল। চৌবাচ্চা আর পাইপ বসাল, তারপর মাটি চাপা দিয়ে উপরের জমি সমান করে দিল। ওদিকে শেষ মাথায় ছোট একটি ঘর তুলল। খুব দ্রুত ওরা কাজ সম্পন্ন করল। এবং এক মাসের মধ্যে আমাদের সেই রাজ্যে, আমাদের পার্কে, এক নতুন পরিপাটি পেট্রল-পাম্প মাথা তুলে দাঁড়াল। ওর কাচের দেয়ালের ভেতর দিয়ে দেখা যায় তাকে থরে-থরে হলুদ তেলের টিনের সারি সাজানো রয়েছে। তারপর যখন সবকিছু প্রস্তুত হয়ে গেল, এবং ফিটফাট অমায়িক সেল্‌সম্যানরা যার যার জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হলো, মোটরগাড়ি, ব্রেকের ধাতব শব্দ ওখানে এসে থমকে দাঁড়াতে লাগল। তারপর একসময় যখন আবার ছোট পার্কটিতে সেই সবুজ ঘাসের মাটি ফিরে এল, সবচেয়ে প্রকাশ্য একটি জায়গায় একটি ফলকের আবির্ভাব হলো, তাতে লেখা রইল ঃ "ঘাস থেকে দূরে থাকুন।"

ওরা এই সবই এমনভাবে করল যেন ওই ছোট পার্কটা ওদেরই সম্পত্তি এবং আমরা বলে কোথাও কিছু নেই। ওই পার্কে আগে খেলাধুলোয় আমাদের যেমন অফুরন্ত উৎসাহ ছিল, ঠিক তেমনি হঠাৎ করে ওখানে খেলার ব্যাপারে আমরা একেবারে উদাসীন হয়ে গেলাম। অবশ্য ওই বিজ্ঞপ্তি-ফলকটার জন্যে আমাদের খুব যে মাথাব্যথা ছিল এমন নয়, সেই রাত্রেই ওটাকে টান মেরে ভূগর্ভ-ঘরে ফেলে দিয়েছিলাম। ওরা যে নামেই ডাকুক, ওই পেট্রল-পাম্প বা সার্ভিস স্টেশন, ওই জিনিস এমন এক জায়গায় এসে বেমালুম তার দখল কায়েম করল যে জায়গায় অন্য পাড়ার একটা ছেলেকে আমরা পা রাখতে দিই নি, যদি কেউ রাখতে চেয়েছে তাকে প্রথমে একান্ত মনে শপথ নিতে হয়েছে। ওই পেট্রল-পাম্প বা সার্ভিস স্টেশনটাকে মেনে নেয়াই আমাদের পক্ষে সহজ হচ্ছে না। আর

এই ব্যাপারটাই আমাদেকে সম্পূর্ণরূপে নিস্পৃহ করে তুলল। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে গাড়ি চালানো এবং অন্যান্য দৌড়-ঝাঁপ বন্ধ করতে হলো। কারণ পেট্রল নিতে যাঁরাই আসেন তাঁদের প্রত্যেকে আমাদের দিকে এমনভাবে তাকিয়ে থাকেন, যেন আমরা যা করছি সেই জিনিস তিনি আর কখনো দেখেন নি। এবং কেউ যদি ওইভাবে আমাদের খেলার দিকে তাকিয়ে থাকে, খেলা কি আর সম্ভব হয়? আমরা যা করতে পারি সে হচ্ছে বসে থাকা, গল্প করা, বাচ্চা মেয়েরা বা বুড়িরা যা করে। ওই মেয়েরা সব করল কী, হঠাৎ বাইরে বেরনো বন্ধ করে দিল। আমি অবশ্য বলতে পারব না এর প্রকৃত কারণ কী? সে কি পেট্রল-পাম্পের লোকগুলোর খারাপ আচরণ? নাকি এর কারণ, মেয়েগুলি পঞ্চম শ্রেণীতে উঠলেই অমনি একপেশে হয়ে যায় এবং পুরনো ছেলে-বন্ধুদের আর চিনতে পারে না। যাই হোক, মেয়েগুলো বাইরে আসে না বলে যে আমরা শাপ-শাপান্ত করেছি এমন নয়। যে জিনিস আমাদের সবচেয়ে পীড়িত করেছে সে হচ্ছে ওদের ওই ফটকটাকে নিয়ে আমরা কিছুই করতে পারছি না, ওটাকে উল্টে ফেলে দিতে, ভেঙে ফেলতে পারছি না, বা অন্য কোনো কিছুই করা যাচ্ছে না।

কিন্তু এও সব নয়। সে-বছর আমি যখন গ্রীষ্মের ছুটি কাটিয়ে বাড়ি ফিরে এলাম, দেখি ছোট পার্কটির তিন-ভাগেরও বেশি সদ্য সিমেন্ট-বাঁধাই হয়ে গেছে। কয়েক দিন পর ওরা খবরের কাগজ, ফল ইত্যাদির চারটি তোলা-দোকান বসাল আর চেস্টনাট-গাছ-গুলোতে ময়লার ঝুড়ি লটকাল। মা বললেন, এ যেন ঠিক যে জিনিসটি চেয়েছিলাম তাই। আর বাবা মহা খুশি এই জন্যে যে তাঁকে আর ফুটবল-পুলের কুপন দেয়ার জন্যে সেই কোন্ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে যেতে হবে না। আমরা নীরবে শুধু দেখতে লাগলাম। তোলা-দোকানগুলো চালু হলে সবুজ জমিটুকু মাত্র কয়েক মুঠো ময়লা ধুলোয় ঢাকা এবড়ো-খেবড়ো ঘাসে পরিণত হলো, সমস্ত জায়গাটায় ছেঁড়া কাগজ আর আবর্জনা ছড়িয়ে রইল। আমাদের ছোট পার্কটি উধাও হয়ে গেল, চেস্টনাটগাছের মাথায় তার যে নীরব সবুজ মুকুটগুলি ছিল সেগুলি ছাড়া আর কিছুই রইল না। মনে হলো

আমরা যেন অন্য কোনো পাড়ায় চলে গেছি, যদিও ও-পাড়ায় যে ছোঁড়ারা থাকে তাদের তুলনায় নিজেদেরকে আমরা চিরকাল সমৃদ্ধ আর ভাগ্যবান মনে করতাম।

আমরা জানি না কী করব! আমরা যখনি প্রশ্ন করি ওই সব তোলা-দোকান আর অন্য যত-কিছু কেন এখানে বসানো হলো, আমাদের বলা হয়, এ-সবই হচ্ছে ওই পেট্রল-পাম্প আর ট্রামের জন্যে। আর ওই পেট্রল-পাম্প বসানো হয়েছে এই অঞ্চলে ও-জিনিস আর নেই বলে। এইসব ব্যাপার-স্যাপারের মাহাত্ম্য আমরা যদি এখন বুঝতে না পারি বড় হলে ঠিক বুঝতে পারব। অবশ্য ওঁরা বলেন, যাই বলো, বাপুরা, তোমাদের কিন্তু আর খেলার বয়েস-টয়েস নেই। ওঁরা সব্বাই এই এক কথাই বলেন, যেন সব আগে-ভাগে পরামর্শ করে নিয়ে তার পর বলছেন। এবং আমি বুঝতে পারি না ব্যাপারটা আসলে কী? ওরা যদি এখনি বলছে আমরা বড় হলে সব ঠিকঠাক বুঝব, তো তখনি আবার বলছেন আমরা বড় হয়ে গেছি, আমাদের আর খেলার বয়েস নেই। বড়দের কোনো ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন করার মানে হয় না। আমার মনে হয় না তাঁরা কী বলছেন তাঁরা নিজেরাই তা জানেন। আমরা নিজেরা শুধু এই মহা গুরুত্বপূর্ণ কথাটা জানলাম যে সম্রাটের যদি সাম্রাজ্য চলে যায়, তিনি আর সম্রাট থাকেন না। যে বাচ্চারা খেলতে পায় না তারা অকালে বড় হতে বাধ্য। আমার বাবা বলেন, এই নিয়ে মাথা গরম করা ঠিক নয়। কারণ, ধরো, পার্ক যেমন ছিল যদি থাকতও তাহলেও আমরা খেলা ঠিকই বন্ধ করতাম। কে জানে। হয়তো তাই হবে। তবে তোমাকে জোর করে বড় করার চেয়ে তোমার যখন প্রকৃত বড় হওয়ার সময় হয়েছে তখন যদি তুমি বড় হও তাহলে সেটাই প্রকৃত সুখের ব্যাপার হয়।

তবে কী কারণে যেন আমার মনে হয় সত্যি হয়তো আমরা বড় হয়ে গেছি। বড় না হলে আমরা নিশ্চয় নতুন খেলা বের করতাম। কারণ জায়গা যেমন হোক না কেন, তার উপযুক্ত খেলা রয়েছে। আমার ছোট ভাই এবং আরো কতকগুলো ছেলে তোলা-দোকানগুলোর চারপাশে ছুটোছুটি করে বেড়ায়, মার্বেল খেলে, মানুষের পায়ের তলায় গিয়ে ঢোকে, গাছে চড়ে, সেখানে লোফালুফি খেলে আর এ ওকে, ও তাকে মুখ

ভেংচায়, আর ময়লা ফেলার ঝুড়িতে কে কতবার বল্ ফেলতে পারে তার প্রতিযোগিতা করে। দ্রাগিচার সেই যে চাচা, তিনি এদের দিকেও করুণার চোখে তাকান। (আমি আগে বলেছি, দ্রাগিচার চাচার মাথায় ছিট আছে)। কিন্তু, যাই বলো, আজকের এই ছেলেরা বেশ ভালোই আছে। এমনকি, এরা ওই তোলা-দোকানগুলোর জন্যে এবং অন্য যা সব বসেছে তার জন্যে খুশি। অবশ্য তার কারণ হয়তো এই যে আমাদের সময়ে পার্কটা যেমন ছিল তার কথা ওদের আর এখন মনেই পড়ে না।

কয়েকটি বড় সবুজ গাছ ছাড়া এখন আর কিছুই নেই। আর রয়েছে নামটি। যে-সব ছেলে এখনো ওই দলিত নষ্ট জমিটুকুতে স্টল আর ময়লা ঝুড়িগুলোর মধ্যে ফাঁকে-ফোঁকরে খেলা করে, এখনো তারা ওটাকে "পার্ক" বলে। এবং এই আমরাও এই রকমের সব কথা বলি, বলি, "স্কুলের পরে পার্কে অপেক্ষা কোরো, বুঝলে, আমি তোমাকে ওই স্ট্যাম্পগুলো দেব।" কিংবা হয়তো বলি, "দৌড়ে যাও তো পার্কে, কয়েকটা আপেল নিয়ে এসো।" কিংবা বলি, "তুমি নিশ্চয় দেখেছ গত রাত্রে পার্কে কী হয়েছে? কী, দেখো নি?" ইত্যাদি ইত্যাদি। হ্যাঁ, ওটা যখন সত্যি পার্ক ছিল, ওটা কেমন ছিল অন্তত সেই জিনিসটা আমরা কখনো ভুলব না। কোনো মানুষকে যদি বড় হতে হয়, সে যেন অন্তত এই কথাটা মনে রাখে, সে এক সময় ছোট ছিল।

যাকগে, বড় হওয়া খুব একটা খারাপ কিছু নয়। প্রত্যেক দিন অমরা স্কুলের সামনে ফুটবল খেলি, আর স্কুলের পেছনে আমাদের রয়েছে—

কিন্তু সে হচ্ছে আর এক কাহিনী।